বাতায়ন

ISSUE | MARCH 2022

নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী

ঋতুপর্ণের নারী চরিত্ররা

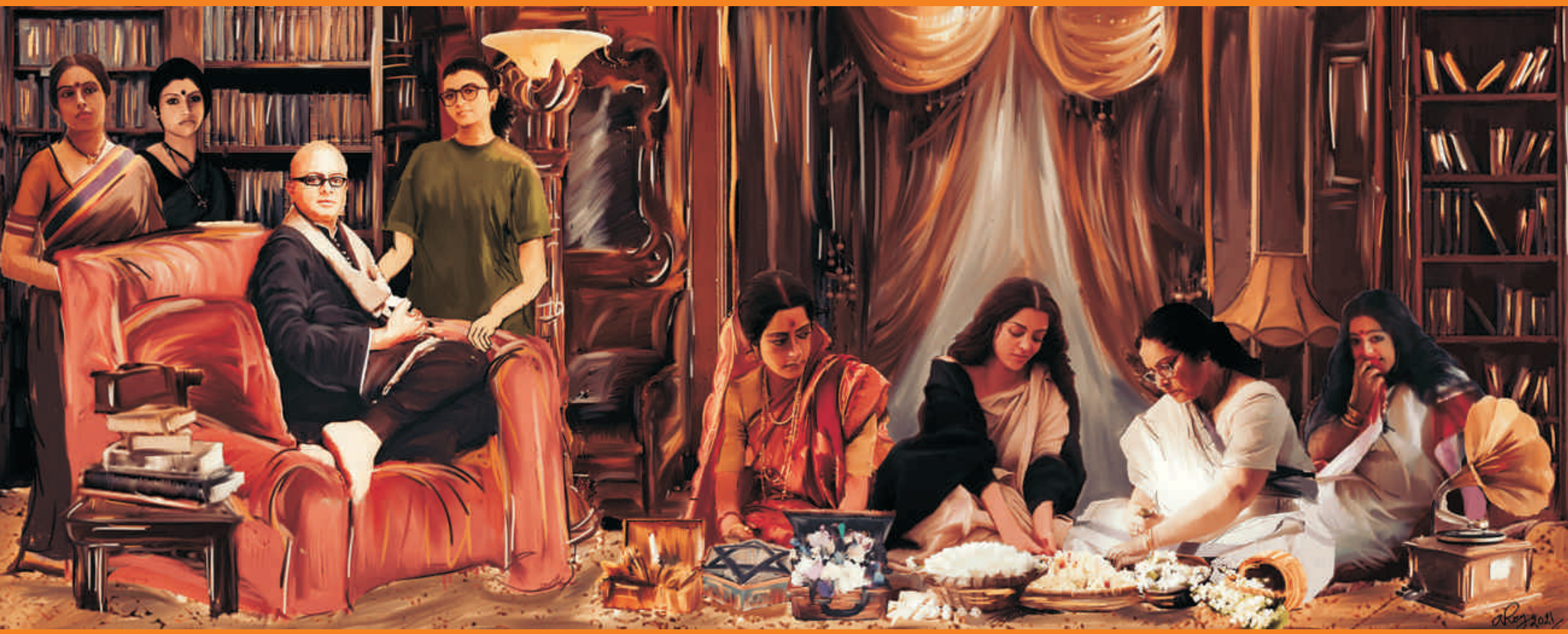

অভিষেক রায়

Batayan

সম্পাদিকা

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

Volume 28 | March, 2022

A literary magazine with an International reach

Issue Number 28 : March, 2022

ISBN : 978-0-6487688-8-3

Editor

Ranjita Chattopadhyay, IL, USA

Sub Editor

Sugandha Pramanik
Melbourne, Australia

Design & Art Layout

Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Support

Susanta Nandi, India

Chief Editor & CEO
Anusri Banerjee
Perth, Western Australia
a_banerjee@iinet.net.au

Published By

BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Photo Credit

Priya Chakraborty, Sydney — **Front Cover & Back Cover**

Priya Chakraborty – "Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead." – An ardent Bukowski fan and a self claimed "bheto-bangali", Chakraborty was born and brought up in Chandannagar, and had always been a art enthusiast, taking up a specific interest in painting and writing. Also, a trained classical dancer, she continues to restore the Bengali in her in bits and pieces, through all things creative and Bengali.

Abhishek Roy, Chicago — **Front Inside Cover**

Abhishek Roy is an avid art enthusiast who has interest in different forms of visual and performing arts. A diploma in fine arts, Abhishek is an ameteur theater actor, photographer, founder member and presenter of a community radio/podcast platform in Chicago, a musician and a film aficionado.

Soma Ghosh (Chakraborty), Manchester — **Back Inside Cover**

সোমা ঘোষ (চক্রবর্তী) – চলতি হাওয়া ও পূর্বপশ্চিম এই দুই পত্রিকার সম্পাদক। UKBC -র একজন ট্রাস্টী। সৃষ্টিসুখ প্রকাশনা থেকে গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। বাচিক শিল্পী হিসেবে কাজ করি। যুক্তরাজ্যে Indian Arts Association নামে একটি কালচারাল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করি। কিঞ্চিৎ লেখালিখি করি আর প্রাণভরে আকাশ দেখি।

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

‘মধুময় পৃথিবীর ধূলি’

পত্রিকার বিষয়বস্তু সহজেই অনুমান করা যায়। নারীত্বের উদ্‌যাপনের কোন বিশেষ দিন নেই। নেই কোন বিশেষ মাসও। নারী ও প্রকৃতি অনেক সময় সমার্থক রূপে ব্যবহার করা হয় শিল্প সাহিত্যে। প্রকৃতির মতোই সমাজে নারী হলেন আদি ও অকৃত্রিম। তাই পৃথকভাবে নয়, মানুষ হিসেবে জায়া-জননী-কন্যাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর সময় এসেছে। কোন মানুষ, তাঁর বহিরঙ্গটি যেমনই হোক না কেন, তিনি নারী না পুরুষ এ বিচারের উর্দ্ধে উঠে তাঁকে তাঁর ব্যক্তিত্বের নিরিখে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

নারীদের মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি কিন্তু সহজে আসে নি। লড়াই করতে হয়েছে অনেক। কবি প্রশ্ন তুলেছেন “নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার / কেন নাহি দিবে অধিকার ?” সে অধিকার কাউকে দিতে হয় নি। নিজেদের অধিকার নিজেরাই আদায় করে নিয়েছেন মহিলারা। সে সংগ্রামের ইতিহাস অজানা নয় কারও। সেসব নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক। তৈরী হয়েছে বিভিন্ন চলচ্চিত্র। জীবনের সবক্ষেত্রেই আজ মহিলারা প্রমাণ করেছেন নিজেদের যোগ্যতা। দক্ষতায় তাঁরা পুরুষদের সঙ্গে সমান অংশীদারিত্বের দাবীদার। সমাজ ও সংসার আরোপিত নানাবিধ বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে তবেই তাঁরা নিজেদের ধী ও ব্যক্তিত্বের জোরে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। নারীবাদের ভিত্তি হল সাহস, সহিষ্ণুতা মমতা ও নিষ্ঠা। সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠন করতে এই গুণগুলি আবশ্যক। আর তাই রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, এককথায় মনন-চিন্তনের বিভিন্ন শাখায় একটি মেয়ের সাফল্যের প্রতি আলোকপাতের প্রয়োজনীয়তা। তার লড়াই সকলের জন্য শিক্ষণীয়।

ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গে যাঁদের নাম মনে এল তাঁরা বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতির জগতে উজ্জ্বল তারকা হিসেবে পরিচিত। গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, লতা মুঙ্গেশকর, বীরজু মহারাজ, শাঁওলী মিত্র চলে গেলেন। একে একে নিভিছে দেউটি। চলে গেলেন বাঁটুল দি গ্রেট এর স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথও। একটু একটু করে নিঃস্ব হচ্ছি আমরা। এখন অপেক্ষা আগামীর। নতুন সৃষ্টির। আর সেটাই আশার কথা।

প্রবাদপ্রতিম নাট্যব্যক্তিত্ব শাঁওলী মিত্রকে আমরা স্মরণ করলাম শ্রদ্ধায়। স্মরণ করলাম অন্যান্য পূর্বসূরীদের যাঁরা না থাকলে আমাদের এই সময়ের সাহিত্য এমন বর্ণময় হত না।

আপনাদের সকলের জন্য সবসময় আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা। ভাল থাকবেন। এ বসন্ত মধুময় হোক।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
‘বাতায়ন’ গোষ্ঠী সম্পাদক
শিকাগো, ইলিনয়

> **“No country can ever truly flourish if it stifles the potential of its women and deprives itself of the contributions of half of its citizens.”**
>
> — Michelle Obama

কবিতা

সৌমিত্র চক্রবর্তী
দূর হটো! 6

তপনজ্যোতি মিত্র
কবি কথোপকথন 7

মৌসুমী রায়
গাছ ও এক নারীকথা 9

আনন্দ সেন
তিন পাল্লার আয়না 10

সুদীপ্ত ভৌমিক
শাঁওলী মিত্র 13

দেবীপ্রিয়া রায়
বাংলা সাহিত্যের প্রথম লেখিকারা 16

উদ্দালক ভরদ্বাজ
জোয়ান কাইগার (১৯৩৪-২০১৭) 23

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়
লিপির দিনলিপি 29

সুনন্দা বসু
দিগন্তে 34

পৃথা ব্যানার্জী
“নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী” 36

শুভ্র দাস
কালো কালি ও লাল আপেল 45

শাশ্বতী বসু
দৈত্য-দলনী 48

প্রিয়া চক্রবর্তী
হারিয়ে গেছে যারা 51

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
‘বদনাম’, সৌদামিনী ও আপাতবিরোধী বিশ্বস্ততা 54

গল্প

সুজয় দত্ত
অর্ডি-নারী 58

ঊর্মি চক্রবর্তী
আন্তর্জাতিক নারী দিবস 67

মিত্রা দত্ত
টিকটিকি 69

সোমা ঘোষ চক্রবর্তী
আলো 75

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য
পাঠকের কলম থেকে:- 82

সৌমিত্র চক্রবর্তী

দূর হটো!

আমি তোমার গায়ে কোনো দাগ দেবোনা।
অপবাদ, অসম্মান, কাম, চাহিদা,
এমনকি পরিচয়েরও নয়।
তোমার জন্য আলাদা করে
ম্যাগাজিনের একটা পাতাও বরাদ্দ করবনা আমি,
ফেসবুকের একটা পোস্টও নয়।
আমি কেবল মুগ্ধ হয়ে দেখব তোমাকে।
ছোটবেলা থেকে বড়বেলা থেকে বুড়োবেলা
দেখব আর ভাবব,
কিভাবে অসীম সসীম হয় অনায়াস !
কিভাবে সৃষ্টি, বপন, ধ্বংস
একজোট দাঁড়াতে পারে বরাভয়ে।
আকাশের গায়ে পারবনা বলেই
আমি তোমার গায়ে
নির্দিষ্ট কোনো দাগ দেবনা নারী,
তুমিও দিওনা।
পেতো না হাত এ' দিবস নিতে,
প্রত্যাখ্যান করো,
মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে বলো,
আমি অনন্ত,
আমি সময়,
সময়ের দিনের দরকার নেই,
নারী দিবস দূর হটো !

তপনজ্যোতি মিত্র

কবি কথোপকথন

– হ্যাঁ এইটা ।
– কোনটা ?
– এই কবিতাটা ?
– কোনটি বলতো ?
– "সেদিন চৈত্র মাস, তোমার চোখেই দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ" ।
– হ্যাঁ, কি ?
– কি করে লিখলেন গুরুদেব ?

কবি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন
– মনের সেই গহন চেতনা থেকে, ভালোবাসার উজ্জ্বল অনুভব থেকে ।
– কোন চরিত্রটি মনে ছিল আপনার ?
– সে এক কল্পনাময়ী ।
– কল্পনাময়ী ?
– হ্যাঁ, তার চোখে যেন জমা হয়েছিল পৃথিবী পারের কোনো দীঘল আকাশের রূপকথা !
– বড় আশ্চর্য কবিতার লাইন দুটি ।
– তোমার ভাল লেগেছিল, জীবন ?
– শুধু ভাল লাগা ? সেই আর্তিময়তা আমাকে যেন বিদ্ধ করল, আমি প্লাবিত হলাম !
– তাই ?
– হ্যাঁ ।
– সেই জন্যই কি তুমি হাজার বছর পথ হাঁটলে ?
– হ্যাঁ গুরুদেব, সেই হাজার আলোকবর্ষ পেরিয়েই তো তাকে একবার মাত্র দেখা যায় !

– শুধু দেখা ? জানার কি হবে ?

– সে ত আজীবন থেকে যায় অচেনা অজানা !

– মনের গহনতম চেতনার মতন ?

– হ্যাঁ ।

– আমরা যেন সেই একই পথের পথিক না, জীবন ?

– হ্যাঁ গুরুদেব, শুধু প্রকাশের ভঙ্গি, প্রকাশের মূর্ত চেতনা, প্রকাশের শব্দমালা বদলে যায় ।

– কখনো তো কোন শব্দই থাকে না, তাই না ?

– হ্যাঁ, কখনো শুধুই হিরণ্ময় নৈঃশব্দ্য ।

– অর্ধেক আকাশকে কি আমরা পুরো সম্মান দিতে পেরেছি জীবন ?

– এখনো সম্পূর্ণ পারিনি গুরুদেব, তাই তো কবিতা আর জীবন এখনো আলাদা তাঁদের জন্য ।

– হয়তো কোনদিন মিলবে, না ?

– হ্যাঁ, আর তখন আমরা হয়তো নতুন দৃষ্টি পাব অর্ধেক আকাশকে তার আপন সৌন্দর্যে, কর্মে, বেদনায়, আনন্দে, গভীরতায় অনুভব করার ।

– তখন, সেদিন চৈত্র মাস আর পাখির নীড়ের মতো চোখ সব একাকার হয়ে যাবে, না ?

– হ্যাঁ গুরুদেব ।

নদী তার চলার পথে এক মুহূর্ত যেন থমকে দাঁড়িয়ে দুই কবির কথা শুনছিল, তারপর আবার তার পথ চলা শুরু হল মোহনার দিকে ।

কোথায় যেন তার জন্য সমুদ্র অপেক্ষা করে থাকছিল ।

মৌসুমী রায়

গাছ ও এক নারীকথা

পাঁচিলের ওপারে উঁচু গাছটা আজও ঠিক একইভাবে দাঁড়িয়ে। তাকে জড়িয়ে অজস্র গাছেদের আশ্রয়।
ওদের পেঁচিয়ে ওঠা শরীরে গুঁড়ি ঢাকা পড়ে গেছে বহুদিন। বহরেও হয়েছে দ্বিগুণ।

মা রান্নাঘর থেকে শাড়ির আঁচলে হলুদ মাখা হাতটা মুছতে মুছতে এসে বসতো জানলার ধারে। কপালে বড়ো একটা লাল টিপ।
তাকিয়ে থাকতো গাছটার দিকে। আনমনে।

মা আজও তাকিয়ে থাকে। আমাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয় হয়ে গাছের মতই চুপচাপ সয়ে যায় সব।

কথা নেই চলা নেই তবু প্রাণ আছে গাছটার।
আঁকড়ানো শেকড়ের জাল তিল তিল করে শুষে নেয় প্রাণরস প্রতি পল।
খসে পড়া বিদ্যুৎ চুম্বন এঁকে দিয়ে যায় মাথা ছুঁয়ে।
ঝলসানো চেহারাটা....
লুকিয়ে রাখে হিমঝরা রাতের মসৃণ মখমলে।
হাওয়ার দোলায় সকলের সাথে মিলেমিশে অক্লেশে মাথা নেড়ে হাসে। ভালোবাসে।

ঝরাপাতা কালে বিষণ্ন মন।
খালি মগডালে বাজ পাখি আসে জিরোতে। শকুনের দল মিটিং সেরে নেয় কখনও।
মায়ের মতো আশ্রয়ে আস্কারা পায় ওরাও।

একটা পাঁচিলের দূরত্ব ছিলো মা আর তার। আর আজ ....
সেবা যত্ন আর আজীবন শ্রমশেষে সেই নারীর ব্যস্ততাহীন অখন্ড অবসর।

মা ও আজ গাছ হয়ে গেছে। শুধু চেয়ে থাকে।
মৃদু হাসে। মাথা নাড়ে।
মায়ামাখা দুচোখের কোণ চিকচিক করে ওঠে।
শেকড়ে টান পড়ে
ক্রমশ তলিয়ে যাই আমি....
তার সুদীর্ঘ ছায়াপথে অপার সংশ্লেষ-ঋণ।
সাদাকালো স্মৃতি-উপচোনো ভিড়।
অন্তিম অপেক্ষার মাঝে তাও প্রাণপণ বেঁচে থাকা তার একান্ত বৃত্তসুখ ঘিরে।

আনন্দ সেন

তিন পাল্লার আয়না

প্রত্যেকটা মেয়ের অনেক গুলো গল্প থাকে
কিম্বা অনেক গুলো মেয়ের একটাই গল্প

মিঠি হল ফ্রকের ঝুল
লাল বিনুনি, পাড়ার স্কুল
মিঠি হল শীতবারান্দা
পায়ের তলায় ধুলো
হজমিগুলি, দাড়িয়াবান্ধা
বন্ধু অনেকগুলো

মিঠি থাকে বাবা মায়ের ভালবাসা শাসনে
মিঠি থাকে লক্ষ্মণরেখায়, মিঠি তাই জানে
জানে যা ওর ভাই পারে তা ও পারে না
পারে না বেশি রাতে বাড়ি ফিরতে
পারে না ইচ্ছে নিয়ে লোফালুফি খেলতে
ফ্রকের ঝুল বাড়ে
এগিয়ে আসে রাত
রাত বাড়তে বাড়তে
বাড়তে বাড়তে
একদিন মিঠি ফ্রক থেকে শাড়ি হয়ে যায়।

"শাঁওলি নামটায় একটা রং আছে
তোমার নাম আজ থেকে হোক উমা
তুমি এ বাড়ির বউ, তোমার কাছে
এ সংসার থাকুক জমা।"
শাঁওলি মানে শামলা মেয়ে
শাঁওলি মানে দখিন হাওয়া
শাঁওলি মানে হঠাৎ বিয়ে
উমার কাছে বিকিয়ে যাওয়া।

উমা মানে সব্যসাচী,
বাপের বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি
জানলা দিয়ে লুকিয়ে দ্যাখে
কলেজ ফেরত সুতির শাড়ি।

উমা মানে স্বামীর গলায়
ঝুলিয়ে দেওয়া মুক্তোমালা
উমা মানে শামলা মেয়ের
দরজাগুলোয় পড়ল তালা।

সারাদিন সংসারের ধকল ঠেলে
রাত্রে স্বামীর নখ, দাঁতের আঁচড়ে কামড়ে
জর্জরিত হয় উমা
পরিতৃপ্ত, ঘুমন্ত স্বামীর পাশে
নিস্তেজ শুয়ে সে তখন জানলা দিয়ে
রাঙাভাঙা চাঁদ দ্যাখে আর প্রাণপণ
মনে করার চেষ্টা করে কালো রঙের
দুর্গামূর্তি কখনও দেখেছে কিনা।
মনে করতে করতে
করতে করতে
যুগান্ত পার হয়ে
পালটে যায় শাড়ির রং।

হেমাঙ্গবালা থাকেন ছেলের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে।
হেমাঙ্গবালা বৃদ্ধা এবং অধিকন্তু
থাকলে ভাল, না থাকলেও কিছু নয়
ব্রত করেন, নিয়ম মানেন, কিন্তু
মাঝে মাঝে মাংস খেতে ইচ্ছে হয়।
হেমাঙ্গবালা বাড়ির মাথা
সবার মাঝে থাকেন একা
বিকেল বেলায় কখন সখন
নিজের সাথে নিজের দ্যাখা।
আকাশের দিকে তাকিয়ে
ভুলে যাওয়া বাবা মা র মুখদুটো
মনে করে তাঁদের একটাই প্রশ্ন করেন
"গানটা শিখিয়ে ছিলে কেন ?"

মিঠি, শাঁওলি, আর হেমাঙ্গবালার
দ্যাখা হয় চিলেকোঠার ঘরে,
এক ধুলোপড়া তিনপাল্লার আয়নায়।
তারা তাদের গল্প বলে
তাদের পাওয়া না পাওয়ার গল্প
তাদের হারানো চাওয়ার গল্প
তাদের অতীতের গল্প
অন্যের লিখে দেওয়া গল্প ।

বলতে বলতে
বলতে বলতে
একদিন তারা সব কথা থামিয়ে
তুলে নেয় কাগজ কলম
লিখে যেতে থাকে
স্বপ্নের গল্প, ইচ্ছের গল্প, কামনার গল্প।
ভবিষ্যতের জন্য।
উত্তরসূরির জন্য।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শাঁওলী মিত্র

শাওলি মিত্র 'নাথবতী অনাথবৎ'-এর মঞ্চে

Courtesy – Google Photos

সুদীপ্ত ভৌমিক

শাঁওলী মিত্র

বাংলা থিয়েটারের সবচেয়ে উদযাপিত পরিবার, মিত্র পরিবার। আর সেই পরিবারের শেষ সদস্য শাঁওলী মিত্র চলে গেলেন কিছুদিন আগে (১৬ জানুয়ারি ২০২২)। শম্ভু মিত্র এবং তৃপ্তি মিত্র বাংলা থিয়েটারের যে ঘরানা সৃষ্টি করেছিলেন শাঁওলী তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী। সৎনাট্য নির্মানের তাগিদে শম্ভু এবং তৃপ্তি মিত্রের আপসহীন সংগ্রামের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই ধ্বজা বহন করা সহজ হয়নি মোটেই। দেশজোড়া খ্যাতি, অসংখ্য পুরস্কার, আন্তর্জাতিক সম্মান, এত কিছু পাবার পরও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে তীব্র অবহেলা, অহেতুক সমালোচনা, নিন্দা, পরশ্রীকাতরতা ও ঈর্ষা। তাই থিয়েটারের মত যৌথ শিল্পের কর্মী হয়েও থেকে গেছেন একা। চলেও গেলেন একা।

শাঁওলী যখন জন্মেছেন, তখন তাঁর মা বাবা দুজনেই তাদের সৃষ্টিশীল জীবনের শিখরে। বাংলা থিয়েটারকে নতুন ভাষা দিতে, তাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত এই দুই শিল্পী। ফলে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুর মত বড় হয়ে ওঠা শাঁওলির ভাগ্যে ঘটেনি। মহলা কক্ষে কেটেছে অধিকাংশ সন্ধ্যে। বাবা মা'র সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছেন মফস্বল শহরের মঞ্চে মঞ্চে। সমবয়স্ক বন্ধুর চেয়ে নাটকের নানান চরিত্রের সঙ্গেই তার ভাব জমত বেশি। প্রথম শেখা বুলির অধিকাংশই ছিল থিয়েটারের সংলাপ। থিয়েটারে জারিত পালিত শাঁওলীর কাছে মঞ্চ ছাড়া জীবন এক অকল্পনীয় অস্তিত্ব। তবু এই মঞ্চকেই তিনি একাধিকবার ত্যাগ করতে চেয়েছেন। তীব্র অভিমানে সরে থাকতে চেয়েছেন পাদপ্রদীপের আলো থেকে বহুদূরে। কিন্তু তবু বার বার তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছে সেই থিয়েটারেরই টানে।

বাবা মা দুজনেই প্রথিতযশা শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও শাঁওলীর শৈশব কেটেছে আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে। সে সময়ে কেবল মাত্র থিয়েটারে অভিনয় করে স্বচ্ছল জীবন যাপন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। শাঁওলী মিত্র তাঁর শৈশবের গল্প করতে গিয়ে বলেছেন, একবার বাবা মা সিনেমার কাজে মুম্বাই গিয়েছেন। পাড়া প্রতিবেশী যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমার বাবা মা বম্বে থেকে কি আনবেন? শাঁওলী বলতেন, আমার জন্য পটল আনবেন, কপি আনবেন। অর্থাৎ সেই সময়ে পটল, কপি এই সবই তার কাছে মহার্ঘ বস্তু। শম্ভু এবং তৃপ্তি মিত্র চলচ্চিত্রে অভিনয় করার ডাক যে একেবারেই পাননি তা নয়, কিন্তু মঞ্চের প্রতি দায়বদ্ধতা চলচ্চিত্রের দিকে নজর দেবার তেমন সুযোগ দেয়নি কখনো। অনেক সময়ে শাঁওলীকে একা রেখে বাবা মা চলে গেছেন থিয়েটারের কাজে। একাকীত্বের মধ্যেই বড় হতে হয়েছে শাঁওলীকে। দিনের পর দিন কেটে গেছে, একই বাড়িতে থেকেও বাবা মা'র সঙ্গে দেখা হয়নি। যখন শাঁওলী বাড়িতে তখন বাবা মা কাজে। আর যখন বাবা মা বাড়িতে তখন শাঁওলী স্কুলে। তাই ছোটবেলা থেকেই অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে শিখেছেন শাঁওলী। একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "ছোটবেলা থেকে শিখেছি, চাইতে নেই। তাই যেটুকু পেয়েছি, তাতেই আনন্দ পেয়েছি অনেক বেশি। স্কুলে টিফিনে ছুটিতে সামান্য একটু চুরণ কিনে খেতে পারলেই মনে হত জীবন সার্থক।"

"ছেঁড়া তার" নাটকে খুব শিশু বয়েসেই প্রথম অভিনয়। তারপর থেকে অভিনয়ই জীবন। কিন্তু এই অভিনয় জীবনেও ছেদ পড়েছে বহুবার। কখনও স্বেচ্ছায়, কখনও বা শারীরিক অসুস্থতার কারণে। একটা সময় ছিল যখন দীর্ঘদিন অসুস্থ থেকেছেন – কখনও হাসপাতাল, কখনও বাড়ির রোগশয্যাই ছিল তার আশ্রয়। নাট্যচর্চা বলতে বাড়িতে নাটক পাঠ, নাটক আলোচনা। আর বই পড়া। সেই সময়ে কন্সতান্তিন স্তানিস্লাভস্কির "মাই লাইফ ইন আর্ট" পড়ে ভীষণ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, থিয়েটার তো করতে পারব না জীবনে। যদি একটা থিয়েটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে পারি, যেখানে বাংলার নাট্য জগতের দিকপালরা নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের তৈরি করবে। সেই সময়ে নাট্যমঞ্চ তৈরির স্বপ্নকে বাস্তয়াবিত করতে মিত্র বাড়িতে দিকপালদের আনাগোনা। কিন্তু সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। নানান

সমস্যায় জর্জরিত হয়ে নাটমঞ্চ তৈরির পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। যারা অর্থ সাহায্য করেছিলেন, তাদের টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। শাঁওলী কিন্তু তার স্বপ্ন সত্যি করেছিলেন, যদিও বহুবছর বাদে। ১৯৮৪ সালে তৈরি করলেন "পঞ্চমবেদ চর্যাশ্রম" একটি ব্যতিক্রমী নাট্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেখানে কেবল অভিনয় নয়, নাট্যকলাকে আয়ত্ব করতে যা যা শিক্ষার প্রয়োজন সব শেখানোর ব্যবস্থা থাকবে। অভিনয় শিক্ষার জন্য ছিলেন তৃপ্তি মিত্র এবং শাঁওলী নিজে। শম্ভু মিত্র নির্দেশনার নানান দিক নিয়ে আলোচনা করবেন, কালিপ্রসাদ ঘোষ থিয়েটারের টেকনিকাল দিকটা শেখাবেন। মোহিত চট্টোপাধ্যায় টেকস্ট আন্যালিসিস। এছাড়া গান, নাচ, মেকআপ, মূকাভিনয় শিক্ষা দিতেন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা। সৌভাগ্যক্রমে চর্যাশ্রমের প্রথম ব্যাচে ভর্তি হবার সুযোগ ঘটেছিল আমার। সেই সময়ে যারা আমার সহপাঠী ছিলেন, তাঁরা অনেকেই পরবর্তী জীবনে মঞ্চ, চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনে অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, যেমন পার্থসারথি দেব, বিজয়লক্ষ্মী বর্মন প্রমুখ।

শাঁওলী স্বেচ্ছায় থিয়েটার ছাড়তে চেয়েছেন বেশ কয়েকবার। ১৯৭৯ সালে বহুরূপী ছেড়েছেন। তারপর দীর্ঘদিন মঞ্চে অভিনয় করেননি – শ্রুতি নাটক ছাড়া। রেডিও নাটকে শাঁওলীর জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। কিন্তু একটা সময়ে শ্রুতি নাটক করতে করতে মনে হয়েছে, কিছু যেন বাকি থেকে যাচ্ছে। কণ্ঠ ব্যবহার করে বাচিক শিল্পকে জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠা করেছেন ঠিকই, কিন্তু বাকি দেহটা তো ব্যবহার করতে পারছেন না। অর্থাৎ, মঞ্চে উঠে কেবল আবৃত্তি বা নাটক পাঠ করেই তৃপ্তি হচ্ছে না। মঞ্চের আলো তাকে ডাকছে। মঞ্চ সজ্জা, মঞ্চের স্পেস তাকে ডাকছে। সেই সময়েই তার মাথায় আসে মহাভারতের কথা – দ্রৌপদীকে নিয়ে একটা নাটক করার কথা ভাবেন। বাবাকে জানান সে কথা। শম্ভু মিত্র অবশ্য খুব একটা উৎসাহ দেখাননি। তবে বারণও করেননি। ইরাবতী কার্ভের "যুগান্ত" বইটা শাঁওলীর হাতে তুলে দিয়ে বলেন, এটা পড়ে দেখ, হয়ত কিছু উপাদান পাবি। "যুগান্ত" পড়ে, বিশেষ করে ইরাবতীর দ্রৌপদী চরিত্রের বিশ্লেষণ পড়ে, শাঁওলী চমকে উঠলেন। এ তো তারই মনের কথা। মাথায় তখন ঘুরছিল একটা গানের লাইন, "কিছু কথা বলতে চায় মন ..."। সেই গান দিয়েই শুরু করলেন "নাথবতী অনাথবত"। আর এই একটা নাটক তৈরি করল ইতিহাস। নিয়ে এল খ্যাতি, পুরস্কার (শিরোমণি পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, পদ্মশ্রী, সংগীত নাটক একাডেমী পুরস্কার ইত্যাদি)। সেই সঙ্গে এল অর্থ ও প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তার সঙ্গে কিছু ঈর্ষাকাতর শত্রুও তৈরি হল। নব্বুইয়ের দশকে, তাই আবার থিয়েটার ছাড়লেন শাঁওলী।

সেই সময়ে একবার এসেছিলেন আমেরিকায়। নিউ জার্সিতে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ওঁর মুখেই শুনলাম এই দুঃসংবাদ। বললেন ওর অভিমানের কথা। থিয়েটার করার পরিকাঠামোর অভাবের কথা। বললেন, যেভাবে থিয়েটার করতে চাই, করতে পারছি না। কলকাতার অধিকাংশ থিয়েটার কর্মী মিডিওক্রিটির সঙ্গে আপস করতে করতে ভুলেই গেছে ভাল থিয়েটার কি। তাও চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারপরও কথা শুনতে হচ্ছে। "নাথবতী" করে আমি নাকি বড়লোক হয়ে গেছি। এভাবে কাজ করার চেয়ে না করা ভাল।

খুব দুঃখ পেয়েছিলাম কথাগুলো শুনে। বার বার অনুরোধ করেছিলাম থিয়েটারকে যেন না ছাড়েন। কিন্তু শাঁওলীদি রাজী হননি। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "আমার বাবা মা'র থিয়েটারের প্রতি যে অপ্রতিরোধ্য প্রেম ছিল, আমার তা কখনোই ছিল না। তাই থিয়েটার ছেড়ে যখন থেকেছি, খুব একটা অভাববোধ কিছু হয়নি।" তবু এই ছেড়ে থাকাও খুব বেশিদিন থাকেনি। কেবল থিয়েটারের টানে, আর কিছু প্রকৃত থিয়েটার প্রেমী ছাত্র ছাত্রীদের টানে, আবার ফিরে আসেন মঞ্চে। পঞ্চম বৈদিকের দায়িত্ব তখন অনেকটাই কাঁধে তুলে নিয়েছেন অর্পিতা ঘোষ। করেছেন একের পর এক প্রযোজনা। ইবসেনের নাটক "The doll's house" অবলম্বনে "পুতুলখেলা" নাটকে নোরার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য ২০০৬ সালে নরওয়ে সরকারের সাংস্কৃতিক দপ্তরের কাছ থেকে পান "ইবসেন সেন্টেনিয়েল এ্যাওয়ার্ড"। কেট ব্ল্যাঞ্চেট, লিভ উলম্যান, ভেনেসা রেডগ্রেভ প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত অভিনেত্রীদের সঙ্গে একসারিতে দাঁড়িয়ে পেয়েছেন এই সম্মান। সম্মানিত হয়েছে বাংলা, সম্মানিত হয়েছে ভারত।

থিয়েটার যেহেতু সমাজের প্রতিচ্ছবি, তাই যে কোন থিয়েটার কর্মীকেই সমাজ ও রাজনীতি সচেতন হতে হয়। শাঁওলীও ব্যতিক্রম ছিলেন না। সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও তার থিয়েটার বলেছে সমাজের কথা, বঞ্চিত মানুষের কথা – সে মহাভারতের কাহিনিই হোক, কিম্বা বিতত বীতংস। কিন্তু সিঙ্গুর ঘটনার পর শাঁওলী আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। প্রতিবাদ করতে পথে নামলেন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষের কথা শুনলেন। সঙ্ঘবদ্ধ করলেন বুদ্ধিজীবী সমাজকে। পরিবর্তন এলো। না, শাঁওলী একা হয়ত সেই পরিবর্তন আনেননি, কিন্তু তিনি পরিবর্তন চেয়েছিলেন। নতুন সরকার গঠনের পর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদও তিনি গ্রহণ করেছেন, এবং তার কাজের জন্য সাম্মানিক পেয়েছেন। আর সেই কারণেও তাকে কথা শুনতে হয়েছে। যেন থিয়েটার করলে তার আর কিছু করে উপার্জন করার অধিকার নেই।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ধীরে ধীরে এসব কাজ থেকেও দূরে সরে যেতে চেয়েছেন। পাদপ্রদীপের আলো থেকে সরে, আড়ালে চলে যেতে চেয়েছেন। মানুষের ভিড় থেকে সবসময় দূরে সরে থাকতে চেয়েছেন এই একক শিল্পী। তার পিতার মতোই ইচ্ছাপত্রে জানিয়েছিলেন, তার মৃত্যুর পর যেন কোন রকম শোভাযাত্রা বা আড়ম্বর না করা হয়। যত শীঘ্র সম্ভব দাহকার্য সমাপ্ত করে তারপর মানুষকে তার মৃত্যুর খবর জানান হয়। কোনরকম আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণ করতেও অস্বীকার করেছিলেন। এ কি নিছক অভিমান, নাকি জীবনের প্রতি এক তীব্র উদাসীনতা ?

চর্যাশ্রম ছাড়ার পর শাঁওলীদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে। চর্যাশ্রমে একবছরের মত শিক্ষাক্রম শেষ করে আমি চলে আসি আমার ডক্টরাল গবেষণার কাজে। শাঁওলীদি হয়ত দুঃখ পেয়েছিলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলেননি। মাঝে মধ্যে দেখা হয়েছে, কিন্তু একটা দুরত্ব থেকে গিয়েছে। তবু ওই এক বছরে শাঁওলীদির স্বপ্নের চর্যাশ্রমে যা শিখেছি, তাই ভাঙিয়েই চালাচ্ছি আমার সামান্য থিয়েটারি জীবন। তাই আজ আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, শাঁওলী মিত্র আমার গুরু – আমি শাঁওলী মিত্রর ছাত্র।

দেবীপ্রিয়া রায়

বাংলা সাহিত্যের প্রথম লেখিকারা

সাহিত্যের কি যুগ নির্ণয় করা যায় ? বোধহয় না। কারণ সাহিত্য কে নিয়ে সাহিত্যের কাছে গল্প শোনানোর আকাঙ্খা তো চিরকালীন, সেই প্রথম মানব যখন ছবিতে আঁচড় কেটে নিজের জীবনের, নিজের পারিপার্শ্বিকের গল্প বলা শুরু করেছিল, সেদিন থেকেই তো সাহিত্যের মুখপাত। যুগে যুগে সাহিত্য মানুষের সাথে সাথে চলেছে, আর তার আয়নায় ধরা পড়েছে সে যুগের সমকালীন সমাজের রীতি, নীতি আচার, আচরণের মাঝে মানুষ মানুষীর হাসি কান্নার ছায়া। তাই সাহিত্যের আদি অন্ত কেই বা বলে দেবে, কে বলবে যে এই এরাই হল প্রথম সাহিত্যিক। তবু ছবি এঁকে সেই গল্প বলার যুগ পিছনে ফেলে রেখে মানুষ এগিয়েছে, তার বিভিন্ন গোষ্ঠী ছড়িয়ে গিয়েছে নানা দিকে, গড়ে উঠেছে নানান সংস্কৃতি, নানা সমাজ। সেই সমাজ সংস্কৃতির মাঝে আবর্তিত সুখ দুঃখ, সেই বিবর্তনের গল্প, বিভিন্ন ভাষায় শাখা বিস্তার করে, জন্ম দিয়েছে বিভিন্ন সাহিত্যের। সেই সাহিত্যের গোড়া পত্তন যাঁরা করেছেন, তাদের চিহ্নিত করাটা কিছু ক্ষেত্রে দুরূহ হলেও অসম্ভব নয়। বিশেষতঃ আমাদের বাংলা ভাষা ও তার সাহিত্য কালের নিরীখে তেমন প্রাচীন নয়, সপ্তম শতাব্দীতে জন্ম নিয়ে আমাদের এই ভাষা চর্যা পদ, লোকগীতি, পাঁচালি, পুরাণ আর বৈষ্ণব পদাবলী – নানান ধারায় বয়ে এসে অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমৃদ্ধ সাহিত্যের রূপ ধরেছে। মোট এই কয়টি শতাব্দীর ইতিহাসে এ সাহিত্যের গোড়া পত্তনকারী লেখকরা, যারা ছিলেন এর প্রথম কারিকর তাঁদের খুঁজে পাওয়া তেমন কঠিন নয়। কিন্তু একটু পর্যালোচনা করলেই চোখে পড়ে এই লেখকদের মাঝে নারীদের সংখ্যা নগণ্যই শুধু নয়, তাঁদের দেখা মেলে দেরীতে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে কাহিনিকার, সে তিনি নারী হন বা পুরুষ, তাতে কি আসে যায় ? কাহিনির গ্রন্থনা বা মনোগ্রাহিতার মাঝেই তো লেখকের পরিচয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে কোন ঘটনাকে দেখা ও বিচার করা সাধারণতঃ নারী ও পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করেন। পুরুষ যখন কাহিনির পরিবেশনা করেন, তখন ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা, চরিত্র চিত্রণ সবই নিপুণ ও মনোগ্রাহী হলেও সমাজ সংসার পরিস্থিতিতে কিংবা পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের পারস্পরিক টানাপোড়েনের মাঝে প্রতিটি নারী হৃদয়ের অনুভূতির ওঠাপড়া, আনন্দবেদনার সূক্ষ্ম সংবাদ যেন অগোচরে থেকে যায়। সেই একই কাহিনি যখন কোন নারীর পরিপ্রেক্ষিত থেকে বলা হয়, তখন সেটি অন্য একটি মাত্রা পায়। উদাহরণস্বরূপ মনে করা যাক এমন এক চিরন্তন গল্পকথার যা বাংলার ঘরে ঘরে প্রচলিত, যে গল্প শুনে আমরা শিশুকাল থেকে বেড়ে উঠেছি – সে গল্প রামায়ণের। পুঁথি বা কাগজে ধরে রাখার বহু আগে হতে কৃত্তিবাস ওঝা এ কাহিনী পাঁচালীর সুরে বাঙালীকে শুনিয়ে গিয়েছেন। পিতৃসত্য রক্ষার্থে অযোধ্যার রাজকুমারের বনবাস, সাগরপাড়ের রাক্ষস রাজা রাবণের হাতে তাঁর সুন্দরী স্ত্রী সীতার অপহরণ আর রাম, লক্ষণের বাঁদর সেনা নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে এনেও প্রজানুরঞ্জনের জন্য নিরপরাধ গর্ভিনী সীতাকে বনবাস দেওয়া – এর বর্ণনা ছড়ায়, গানে, পাঁচালির ছন্দে প্রায় প্রতিটি বাঙালি শুনেছে। কিন্তু বর্ণনা দিতে গিয়ে পুরুষ কাহিনীকার এ কথা বলেছেন বটে যে সীতা আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু তিনি হয়ত চিন্তাই করেন নি যে ঘন জঙ্গলে গর্ভাবস্থায় নির্দোষে নির্বাসিতা সেই একাকীনি রাজবধুটির পলে পলে কি মনের অবস্থা হয়েছিল। সেইজন্য সীতার ভীত ত্রস্ত চিন্তাকুলতা, আশ্রয় খুঁজে মরার আকুতির কথা কৃত্তিবাস ওঝা বর্ণনা করেন নি। সীতার সেই বিহ্বল অবস্থার বর্ণনা খুঁজে পাই ময়মনসিংহের পল্লীবধূ চন্দ্রাবতী রচিত চন্দ্রাবতী রামায়ণে। নালিশ বা অভিযোগ নয়, শুধু সীতার সেদিনের ব্যাকুল ভয় আর চিন্তা বিহ্বলতা-একটি নারী বুঝেছিল আর সেই নিয়ে গান বেঁধেছিল। এই খানেই নারীর দৃষ্টিতে কাহিনি পরিবেশনার সার্থকতা। নারীর কলমে লেখার আরেকটি বৈশিষ্ট ও মনে রাখা দরকার। মেয়েরা যখন গল্প বলেন, সে গল্প হয় সহজ স্বচ্ছন্দ ঘরের ভাষায়, মানুষের মুখের কথায়। বিষয় বস্তু যত গুরু গম্ভীরই হোক না কেন, মেয়েদের গল্প বলার বা আলোচনার ভাষাটি কখনো দুরূহ হয়ে ওঠে না, ভাষার গুরু গম্ভীরতায় তা কখনো গুরুভার হয়ে দাঁড়ায় না বরং থাকে সাবলীল।

অথচ বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগে লেখিকা বা নারী কাহিনিকারের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয়। এখানে একটি কথা অবশ্য বলে নিতেই হবে যে লেখিকাদের অপ্রতুলতা এজন্য নিশ্চয় নয় যে তাঁরা কখনো গল্প বলেন নি। সত্যি বলতে কি, মেয়েরাই গল্প বলেছেন চিরকাল। তাঁরা গল্প বলেছেন ছড়ায়, ব্রতকথায়, নানান অনুষ্ঠানে পালা পার্বণের গানে; আল্পনায়, কাঁথার রঙ্গীন ফোঁড়ে তারা গল্প বলে গিয়েছেন তাঁদের জীবনের হাসি কান্না, আশা আকাঙ্খার। কিন্তু সে সব গল্প কাগজের বুকে কালির আঁচড়ে লেখা হয়েছে বহু পরে একটি দুটি সাহসিকার কলমে। তাঁরা "সাহসিকা" কারণ সেদিনের পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ তাঁদের কলম ধরা দূরে থাকে, অক্ষর পরিচয়ের অধিকার পর্যন্ত দিতে চায় নি। সহজে এ অধিকার পাওয়া যায়নি, এ অধিকার অর্জন করতে হয়েছে বহু আয়াসে, বহু বছরের চেষ্টায়। অষ্টাদশ কি ঊনবিংশ শতাব্দী কেন, এই সেদিন মানে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে অভিজাত পশ্চিম বঙ্গীয় এক বয়োবৃদ্ধা মহিলাকে বলতে শুনেছি যে তাঁদের বাল্যকালে অক্ষর পরিচয় হয়েছিল চাঁদের আলোয় লুকিয়ে, কারণ তাঁর জ্যেঠা মহাশয় স্ত্রী শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এঁদেরই মাঝে থেকে কেউ কেউ সন্তর্পনে আড়াল আবডাল হতে অক্ষর পরিচয় করে ভীরু পদক্ষেপে লেখার জগতে পা ফেলেছেন। শ্রদ্ধেয়া আশাপূর্ণা দেবী তাঁর "প্রথম প্রতিশ্রুতি" উপন্যাসে এদের কথা বলেছেন, "তারা সংখ্যায় অজস্র ছিল না। তারা অনেকের মধ্যে মাত্র এক একজন। তারা একলা এগিয়েছে। এগিয়েছে খানা ডোবা ডিঙিয়ে পাথর ভেঙে কাঁটা ঝোপ উপড়ে। পথ কাটতে কাটতে হয়তো দিশেহারা হয়েছে, বসে পড়েছে নিজেরই কাটা পথের পথ জুড়ে। আবার এসেছে আরেক জন; তার আরব্ধ কর্মভার তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। এমনি করেই তো তৈরী হল রাস্তা।" অবশ্য এর অন্যথা ছিল না, তা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কিছু লেখিকা কলম তুলে নিয়েছিলেন যাঁদের পরিবার ছিল উন্মুক্ত মনের, শিক্ষার আলোয় উৎসাহী। পরিবারের সহায়তা পেয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়েছে তাঁদের লেখনী, যদিও সংখ্যায় তাঁরাও বেশী নন। এই এমনি নানা ধারার কয়জনকে নিয়েই আজকের আলোচনা।

রাসসুন্দরী দেবী – (১৮০৯-১৯০০সন) আলোচনা শুরু করা যাক এমন একজনকে নিয়েই যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল অন্তঃপুর হতে কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ওই অন্তঃপুরের আড়াল হতে তিনি ভীরু পদক্ষেপে নিজের চেষ্টায় অক্ষর পরিচয় করেন ও নিজে নিজে লিখতে শিখে লেখার জগতে পা ফেলেন। তাঁর আত্মজীবনী "আমার জীবন" একটি মেয়ের বাচনিক সে যুগের মেয়েদের ঘরোয়া জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি। এ বই পড়ে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছিলেন, "এই জীবনখানি ব্যক্তিগত কথা বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না – ইহা প্রাচীন হিন্দু রমণীর একটি খাঁটি নকশা। ... এই চিত্রের মত যথাযথ ও অকপট মহিলা চিত্র আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে আর নাই। এখন মনে হয়, এই পুস্তক খানি লিখিত না হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যের একটি অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।" সত্যি বলতে কি পুরুষ কি রমণী লেখক নির্ব্বিশেষে, বাংলা সাহিত্যে এইটিই প্রথম আত্মচরিত।

লেখিকা শ্রীমতি রাসসুন্দরী দেবীর (দাসী) জন্ম হয়েছিল ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে পাবনা জেলার পোতাজিয়া গ্রামে। আশ্চর্যের কথা হল যে নারী সাহিত্যের পথিকৃৎ প্রতিভাময়ী এই মহিলাকে তাঁর অত্যন্ত সরল স্বভাবের জন্য শৈশবে অনেকে নির্বোধ ভাবত। অথচ সেই সময়েই পরিবারের অন্যান্য ছেলেদের পাশে বসে গুরু মশায়ের পাঠ শুনে শুনে বর্ণ পরিচয় সম্বন্ধে তাঁর মোটামুটি ধারণা জন্মিয়ে যায়, যদিও কেউ সে কথা বুঝতে পারেনি এবং তিনিও সে সময় সে কথা কারুকে বলেননি। ১২ বছর বয়সে ফরিদপুর জেলার জমিদার সীতানাথ শিকদার মহাশয়ের সাথে তার বিবাহ হয়ে যায় এবং তিনি ক্রমে ১২ টি সন্তানের জননী হন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন যে উদয়াস্ত ঘরের কাজে, ছেলে মানুষ করায় ব্যস্ত থাকার দরুন অনেক সময় তিনি দিনের পর দিন আক্ষরিক অর্থে খাওয়ার ফুরসৎ পাননি। একাদিক্রমে কয়দিন টানা উপবাসে দিন কেটে গেছে তাঁর বহুবার। বিত্তবানের স্ত্রী হওয়াসত্ত্বেও তাঁর স্বাধীনতা ছিল নামমাত্র, বরং বিধি নিষেধের বেড়া এতই কঠিন ছিল যে নিজের মায়ের দেহাবসানের খবর পেয়েও তার শেষ দেখা করতে যাওয়া হয় নি। কিশোরী বধূটি আবক্ষ ঘোমটায় মুখ ঢেকে নীরবে কাজ করে যেতেন। পরের দিকে যদিও সংসারে তার পদোন্নতি ঘটে এবং তিনি নিজের সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে ওঠেন, তবু কর্মব্যস্ততার ভার কমেনা। আশ্চর্যের বিষয় এর মাঝেও

লেখাপড়া শেখার অদম্য উৎসাহ তাঁর অন্তরে স্তিমিত হয়ে যায়নি কখনও, বরং তাঁর সহজাত ধর্মভীরুতা ও ধর্মপিপাসা তাঁর সে উৎসাহকে উদ্দীপিত করেছিল। যদি তিনি পড়তে পারেন তাহলে চৈতন্য ভাগবতের মত ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে পারবেন, এই স্বপ্ন তাঁকে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর সে সময়কার মনের ভাব তাঁর ভাষাতেই শোনা যাক, "আমি মনে মনে মনের উপর রাগ করিতে লাগিলাম। কি জ্বালা হইল, কোনো মেয়ে লেখাপড়া শেখে না, আমি কেমন করিয়া লেখাপড়া শিখিব, একি দায় উপস্থিত হইল .... তখন আমাদিগের দেশের সকল আচার ব্যবহারই বড় মন্দ ছিল না, কিন্তু এই বিষয়টি ভারী মন্দ ছিল, সকলেই ছেলেমেয়েকে বিদ্যায় বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখনকার মেয়েছেলেগুলো নিতান্ত হতভাগা, প্রকৃত পশুর মধ্যে গণনা করিতে হইবেক ... মেয়েছেলের হাতে কাগজ দেখিলে সেটি ভারী বিরুদ্ধে কর্ম জ্ঞান ক রিয়া, বৃদ্ধা ঠাকুরানীরা অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন।"

"কেবল দিবারাত্র পরমেশ্বরকে ডাকিয়া বলিতাম, পরমেশ্বর ! তুমি আমাকে লেখাপড়া শিখাও, আমি নিতান্তই শিখিব।" তার পরে কি করে রাস সুন্দরী সেই চৈতন্য ভাগবত পড়তে সক্ষম হলেন, তার বিবরণ পড়লে আজকের যুগে অবাক হতে হয়, কি করে তিনি পুঁথির একখানি পাতা খুলে নিয়ে পাকশালের কোণায় লুকিয়ে রাখলেন, কেমন করেই বা ঘোমটার নীচে সেটি রান্নার ফাঁকে ফাঁকে দেখে আর নিজের বড় ছেলেটির হাতের লেখা মকশো করা তাল পাতার সাথে মিলিয়ে দেখে তাঁর অক্ষর পরিচয় ঘটল ও তিনি বই পড়তে আরম্ভ করলেন ও ক্রমে ক্রমে লিখতেও শুরু করলেন, সে এক একলা নারীর পথ চলার ইতিহাস। সে কাহিনি নিজের আত্মকথায় লিখতে গিয়ে রাসসুন্দরী বলেন, "আমার লেখাপড়া বড় সহজ কষ্টে হয় নাই, যাকে বলে কষ্ট। সে লেখাপড়ার কথা আমার মনে উদয় হইলে ভারী আশ্চর্য বোধ হয়। আমাকে যেন পরমেশ্বর নিজে হাতে ধরিয়া শিখাইয়াছেন। নতুবা এমন অবস্থায় লেখাপড়া কোন মতে সম্ভব না।" সেই রক্ষণশীল সমাজ ও পরিবারের আচার ব্যবহারকে তিনি ঈশ্বরের বিধান বলে মেনে নিয়েছেন, যদিও সে সবের প্রতি তাঁর অন্তরের বিরাগ তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে।

"বস্তুতঃ পরমেশ্বর যখন যেরূপ আচার ব্যবহার নির্দেশ করিতেছেন, তখন তাহা উত্তম বলিয়া বোধ হয়। সেকালের লোকের সেই মোটা মোটা কাপড়, ভারী ভারী গহনা, হাত পোড়া শাঁখা, কপালভরা সিঁদুর বড় বেশ দেখাইত। আমাদের সকল পরিচ্ছদ যদিও সে প্রকার ছিল না, তথাপি যাহা ছিল তাহাই মনে হইলে ঘৃণা বোধ হয়।"

এই ঈশ্বর বিশ্বাস তাঁকে পারিপার্শ্বিকের সাথে আপস করে চলতে সাহায্য করেছে, তার প্রমাণ তার লেখার ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। যদিও কিছুটা অলৌকিক এবং আধিভৌতিক তত্ত্বের বিশ্বাসও তাঁর লেখায় চোখে পড়ে, কিন্তু তাঁর লেখার মূল সুর তাঁর চরিত্রের সারল্য ও ঈশ্বরবিশ্বাস। তাঁর অকপট সত্য ভাষণ ও বলিষ্ঠ লেখনী পাঠককে আশ্চর্য করে দেয়। দুই শতাব্দী আগে যে অন্তঃপুরিকা পরিণত বয়সে নিজের চেষ্টায় লেখা পড়া শিখে কলম ধরেন, তাঁর লেখায় নিজের দুর্বলতা, নিজের ক্বচিৎ ভুলভ্রান্তি আড়াল করার কোন প্রয়াস নেই। কোন আত্মবিশ্বাসের দ্বারা এটি সম্ভব ? গদ্য লেখার সাথে কবিতার ছন্দেও তাঁর অসামান্য দখল দেখা যায়। ঈশ্বরের স্তুতিতে লেখা তাঁর একটি কবিতার কয়েক ছত্র উল্লেখ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে –

"যিনি জগৎ কারণ, বিশ্বব্যাপী নিরঞ্জন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহাতে।

নাই তাঁর স্থানাস্থান, আছেন তিনি সর্বস্থান, অবিদিত নাই ত্রিজগতে।

শুনে মন বলি তাই, তাঁর পরে আর নাই, সেই বস্তু গোলকের ধন।

সেই হরি দয়াময়, বসাইয়া হৃদয়, জ্ঞান নেত্র কর দরশন।"

শুধু কি কবিতা ? রাসসুন্দরীর কাছে পাঠকেরা পেয়েছেন শ্যামা সঙ্গীত আঙ্গিকে রচিত নানান গান। একটি গানের উদ্ধৃতি দেওয়া গেল –

"তুই শমন কি করিবি জারি, তুই শমন কি করিবি,
আমি কালের কাল কয়েদ করেছি।
মন বেড়ি তার পায়ে দিয়ে হৃদ গারদে বসায়েছি।
শমন রে তুই যা রে ফিরি, হবে না তোর শমন জারী,
আমি সদর দেওয়ানী আদালতে ডিগ্রীজারী করে নিদছি ।
মিছা কেন করিস লেঠা, মানিনা তোর তলপচিঠা,
আমি বাকীর কাগজ উসুল দিয়ে দাখিল করে বসে আছি।"

অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন এই লেখিকার বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৭ সনে। তখন তাঁর ৮৮ বছর বয়স। সমীক্ষার জন্য বইটি পড়ে স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, "... ৮৮ বৎসরের একজন বর্ষীয়সী প্রাচীন রমণীর লেখা, তাই বিশেষ কুতূহলী হইয়া আমি এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হই। মনে করিয়াছিলাম যেখানে কোন ভাল কথা পাইব সেখানে পেন্সিলের দাগ দিব। পড়িতে পড়িতে দেখি পেন্সিলের দাগে গ্রন্থ কলেবর ভরিয়া গেল। বস্তুতঃ ইঁহার জীবনের ঘটনাবলী এমন বিস্ময়জনক এবং ইঁহার লেখায় এমন একটি অকৃত্রিম সরল মাধুর্য্য আছে যে, গ্রন্থখানি পড়িতে বসিয়া শেষ না করিয়া থাকা যায় না।"

এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেই আরেকটি লেখিকার নাম চোখে পড়ে, তবে সেটি ছদ্ম নাম। হয়ত সমাজের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করতে না পেরেই এই ছদ্ম নাম নিয়েছিলেন লেখিকা।

হিন্দু কুলকামিনী – নাম নিয়ে তাঁর লেখা 'দমনোত্তমা' উপন্যাস নবপ্রবন্ধ পত্রিকায় ১৮৬৭ হতে ১৮৬৮ সন পর্যন্ত ধারাবাহিক হিসাবে ছাপা হয়। সময়টি উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনা তখন প্রচলিত ছিল না। ১৮৬৫ সনে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম ইউরোপীয় ধারায় উপন্যাস রচনা শুরু করেন। অর্থাৎ হিন্দু কুলকামিনী, তিনি যেই হন না কেন, এই ধারায় অগ্রণী হয়েছিলেন। তাঁর লেখার বিষয় ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারী শিক্ষার দুর্গতি। তাঁর লিখনশৈলী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে বিষয়বস্তুর বিবরণ পড়ে মনে হয় যে তিনি তৎকালীন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্বভাবে বিদ্রোহিনী।

এবারে ফিরে তাকানো যাক ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। নারী স্বাধীনতা তখনও সম্পূর্ণ স্বীকৃতি পায়নি বাংলার সমগ্র সমাজে, কিন্তু কয়েকটি আলোকপ্রাপ্ত উন্মুক্তমনা পরিবারে দেখা দিয়েছে শিক্ষার আলো। কন্যাদের স্বাধীন সত্ত্বা সম্বন্ধে সচেতনতা জেগেছে সেসব পরিবারের পিতা মাতার মনে। তাই বালিকা বয়সে তাদের বিবাহ দিলেও তাদের আত্মপ্রকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ান নি তাঁরা, বিদ্যাশিক্ষা দিয়েছেন, বিবাহ দিয়েছেন শিক্ষিত পরিবারে। এঁদের মাঝ থেকে বাংলা সাহিত্য পেয়েছে দুটি উজ্জ্বল সাহিত্যিককে। কালের প্রভাবে সে সব নাম আজ বিস্মৃতিতে হারিয়ে গিয়েছে, কারণ যে যুগ, যে সমাজ, যে মূল্যবোধ নিয়ে তাঁরা লিখেছেন, আজকের সমাজ সে সব চেনে না। তাই সে সব লেখা আজ আর পাঠকের অন্তরে অনুরণন জাগায় না। এক কালের বিপুল জনপ্রিয়তা আজ তাঁদের হারিয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু আজকের লেখিকাদের পথ কেটে এগিয়ে এনেছেন তাঁরাই।

অনুরূপা দেবী – তাঁর লেখা অনেক বইয়ের নাম আজকের পাঠক হয়ত চিনবে না, তবে তাঁর গল্প উপন্যাসের ভিত্তিতে তৈরী ছায়াছবি স্বয়ংসিদ্ধা, মা, মন্ত্রশক্তি এসব নাম আজও অনেকের চেনা। জন্ম নিয়েছিলেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে

৯ই সেপ্টেম্বর কলকাতায়। পিতা মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, মা দয়াসুন্দরী। প্রখ্যাত লেখক, সমাজ সংস্কারক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী তিনি। সুশিক্ষিত ও সুসংস্কৃত এ পরিবারে বেড়ে ওঠার ফলে অতি শৈশবেই সংস্কৃত ও দর্শন শাস্ত্রে হাতে খড়ি হয়ে গিয়েছিল তাঁর। দিদি ইন্দিরার সাথে সাথে লেখালেখি করার অভ্যাসও গড়ে উঠে ছিল তখন হতেই। দশ বছর বয়সে সেকালের নিয়মে বিবাহ হয়েছিল বটে, কিন্তু স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশ বিদেশের উপন্যাস পড়তে যেমন ভালবাসতেন, নিজের স্ত্রী টিকেও এ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন প্রচুর। ফলে এক উন্মুক্ত বিদ্যোৎসাহী আবহাওয়ায় অনুরূপা স্বচ্ছন্দে লেখাপড়ার চর্চা চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। সংসার পেতেছিলেন মুজফ্‌ফরপুরে। তিনটি সন্তানের জননী ও সুগৃহিনী ছিলেন, কিন্তু লেখাপড়ায় কামাই দেন নি কখনও। 'রাণী দেবী' ছদ্মনামে গল্প লিখে জেতেন কুন্তলীন পুরস্কার। তারপর তাঁর প্রথম উপন্যাস "চিলকুঠি' ১৯০৪ সনে প্রকাশিত হয় নবনীড় পত্রিকায়। অবশ্য পাঠকমহলে সেটি তখন নজর কাড়েনি। জনপ্রিয়তা পান এর সাত বছর পর ১৯১১ সনে "ভারতী' পত্রিকায় 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর। এর পর আর তিনি পিছন ফিরে তাকাননি। দাপটের সঙ্গে সংসার সামলে লিখেছেন উপন্যাস, গল্প, কবিতা। একের পর এক উপন্যাস লিখেছেন – জ্যোতিহারা, বাগদত্তা, 'পথের সাথী', 'উত্তরায়ণ' মন্ত্রশক্তি, মহানিশা, মা, বিদ্যারত্ন (১৯২০), কুমারিলভট্ট (১৯২৩), উত্তরায়ণ, পথহারা, সোনার খনি, রামগড়, পথহারা, পথের সাথী, রাঙ্গাশাখা। – প্রতিটি উপন্যাস তখন জনপ্রিয়। এদের মধ্যে মন্ত্রশক্তি, মহানিশা, বাগদত্তা, মা নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চে অভিনীত হয়।

সব মিলিয়ে মোট তেত্রিশটি বই লিখেছেন তিনি। শুধু কি তাই ? নিজে সাহিত্য চর্চা করেই তিনি থেমে থাকেন নি। বাংলা সাহিত্য চর্চায় নারীর যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে , সেদিকে এতদিন কেউ দৃষ্টিপাত করেন নি। অনুরূপাই এ বিষয়ে প্রথম ভাবনাচিন্তা আরম্ভ করেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা "সাহিত্যে নারী-স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি (১৯৪৯)"। এই লেখাটি নারী রচিত সাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথম পথপ্রদর্শক বলে গণ্য হতে পারে।

রাস সুন্দরীর মতই অনুরূপার কবিতা লেখার হাতও ছিল চমৎকার, যদিও তাঁর কাব্য শৈলী স্বাভাবিক ভাবেই রাসুন্দরীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক। "ভারতী" পত্রিকার পৌষ ১৩১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কবিতা "দেবদূতের প্রতি রাজা অরিষ্টনেমি"। ভারতী পত্রিকারই কোন এক বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল "মৃত্যুঞ্জয়" নামের নীচের কবিতাটি –

"আপনি সন্ন্যাসী তুমি, সর্বত্যাগী শিব
ভোলা ব্যোমকেশ
তাই নিজ ভক্ত পেলে তারেও সন্ন্যাসী সাজাও মহেশ
আপনি শ্মশানবাসী, অঙ্গে মাখো ছাই
ভিক্ষাপাত্র সার
শ্মশানবহ্নির দাহ বক্ষে দাও তার
ভক্তে আপনার
উন্মাদ তান্ডব খেলা তব ... প্রলয়ের গরজন গান –
তোমার আনন্দগীত তাই ভক্তের রোদনের তান
কালকূটে কণ্ঠভরা তুমি মৃত্যুঞ্জয়
অসীম দুঃখের বিষে জর্জরিত নর"

স্বগৃহে তাঁর স্বাধীনতা ছিল ও সমাজে জনপ্রিয়তা ছিল বিপুল, তাই আত্মবিশ্বাসও ছিল প্রচুর, তাই নিজের লেখাকে নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন তিনি। নিজের কয়েকটি উপন্যাস নিজেই নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন। সে সব নাটকের মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রূপদানে স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ 'মন্ত্রশক্তি' নাটকটি।

সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম ছিল আজীবন, তার প্রমান তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। সেই কারণেই সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি তিনি যুক্ত থেকেছেন সমকালীন নারীর অধিকার আন্দোলনের সাথে। পণপ্রথা, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছিলেন। এ দিক থেকে দেখলে তিনি এক জন সমাজ সংস্কারকও। তাঁর এ কাজে সহযোগিনী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ কন্যা মাধুরীলতা। দুজনে একযোগে মুজফ্‌ফরপুরে "চ্যাপম্যান গার্লস স্কুল" নামের ইংরেজি স্কুল গড়ে তোলেন। স্কুলটি পরিচালনাও করতেন অনুরূপা। এছাড়াও তিনি যুক্ত ছিলেন কলকাতা ও কাশীর কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গেও। মেয়েদেরও যে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন আছে, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অনেক আগেই। নারী কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেন একাধিক আশ্রম। ১৯৩০-এ মহিলা সমবায়ও তৈরি হয় তাঁর পরিচালনায়। এই সব কারণেই ১৯৪৬-এর হিন্দু কোড বিল আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন তিনি।

তবে এত উদার মনা ও সমাজসংস্কারিকা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর লেখা আজকের দিনে পড়তে গেলে বোঝা যায় যে কোনো একটি থেকে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। ডক্টর শিশির কুমার দাস তাঁর সম্বন্ধে একজায়গায় বলেছেন, হিন্দু সমাজের মূল্যবোধ অনেক ক্ষেত্রেই অসঙ্গত ভাবে ও অবাস্তব ভাবে কাহিনির মধ্যে প্রবেশ করেছে। বোধহয় যে সমাজে, যে পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন, তার প্রভাব তিনি সম্পূর্ণ ভাবে এড়াতে পারেন নি। কিন্তু তাতে তাঁর পাঠকদের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কমেনি; বরং তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল সুবিপুল। মনে হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগে যে সময়ে তিনি লিখেছেন, তখন সাধারণ মানুষের জীবন জীবনের ধারাটিই ছিল রক্ষণশীল, তাই তাঁর সমকালীন পাঠকরা তাদের নিজেদের জীবনের সাথে সে মূল্যবোধকে মিলিয়ে নিতে পেরেছে। এখানেই হয়ত নিহিত রয়েছে তাঁর জনপ্রিয়তার সূত্র। কিন্তু তবু বলব যে অনুরূপার লিখিত গল্পে কাহিনির সবলতা ও চরিত্রগঠনের স্পষ্টতা অনস্বীকার্য। বিদ্বান পরিবারে জন্ম নিয়ে শিশুকালে যে শিক্ষাদীক্ষা তিনি পেয়েছিলেন, তা তাঁর কাহিনিতে ছাপ ফেলত মাঝে সাঝে। কোন এক সময় শরৎচন্দ্র অসহিষ্ণু হয়ে তাঁর রচনায় পান্ডিত্য প্রকাশের প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, কিন্তু পাঠক সমাজ কখনই সে পান্ডিত্যে বিরক্ত হয়েছে বলে মনে হয়নি, বরং সম্মানে, উপাধি ও অভিনন্দনে ভরিয়ে দিয়েছে তাঁকে।

১৯১৯-এ শ্রীভারতধর্ম মহামণ্ডল তাঁকে দেয় "ধর্মচন্দ্রিকা" উপাধি। শ্রীশ্রীবিশ্বমানব মহামন্ডল থেকে ১৯২৩-এ পান "ভারতী" উপাধি। আবার ১৯৩১ সনে উত্তর বিহার সাহিত্য সম্মেলনে তাঁকে ডেকে নেওয়া হয় কথাসাহিত্য শাখার সভানেত্রী হওয়ার জন্য। অন্যান্য পুরস্কারের সংখ্যাও তাঁর কম নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৫-এ জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দেয় আর ১৯৪১-এ দেয় ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক। ১৯৪৪-এ তাঁকে ডাকা হয় "লীলা লেকচারার" পদে।

স্বাধীনতা ছিল কিন্তু কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না তাঁর জীবন। আঘাত পেয়েছেন অনেক, কিন্তু সে সব আঘাত সহ্য করে তিনি কাজের মধ্যেই ফিরে গিয়েছেন বারবার। ১৯৩৪-এ মুজফ্‌ফরপুরের ভূমিকম্পে মৃত্যু হয় তাঁর কন্যার, তিনি নিজেও আহত হন। কিন্তু ভেঙে পড়েনি তিনি। হা হুতাশে দিন কাটাননি, মাথা তুলে উঠে দাঁড়িয়ে ভূমিকম্পে সর্বহারাদের সাহায্যের জন্য গড়ে তোলেন "কল্যাণব্রত সঙ্ঘ"। হয়ত সবল চরিত্রের এই সবল ভাব, এই জীবনমুখীতাও তাঁর অসামান্য পরিবার ও বাল্য শিক্ষার ফল।

শিক্ষা চর্চা তাঁর শেষ হয়নি কোনদিন। অনুরূপা দেবীর শেষ জীবন কেটেছে রানীগঞ্জ শহরে নাতি অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর লেখাপড়ায় ছেদ পড়েনি সেখানেও। পথিকেরা প্রায়ই দেখতে পেত বাংলোর বারান্দায়

বসে রোদে চুল শুকোতে শুকোতে বই পড়ছেন বা লিখছেন এক বৃদ্ধা। মাঝে মধ্যে পানের বাটা থেকে পান খাচ্ছেন। ১৯৫৮ সালের ১৯ এপ্রিল রানীগঞ্জেই মৃত্যু এসে জীবনের পট টেনে দেয় বাংলা সাহিত্যের অগ্রণী লেখিকার অধ্যয়ন, মননের এই জীবনে।

অনুরূপা দেবী চলে গেলেন বাংলা সাহিত্যে নারীর পা ফেলার রাজপথ প্রশস্ত করে দিয়ে, কিন্তু পথ কাটার কাজ থেমে যায়নি। তাঁর আশেপাশে তাঁরই মত পথ কেটে চলেছিলেন আরো কতজন। তাঁরা প্রত্যেকে এগিয়ে চলেছিলেন নিজের নিজের মত করে। সন্ধ্যার আকাশে একটি দুটি তারা ফোটার মত তাঁরা ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন নিজের আলো – প্রতিশ্রুতি জানিয়ে দিচ্ছিলেন যে আসন্ন সন্ধ্যায় আরো কত তারা ফুটবে বাংলার সাহিত্যের আকাশে। সেই সব প্রথম তারাদের গল্প, তাদের হারিয়ে যাওয়া কাহিনি, তাই নিয়েই তো আজকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।

Feminism isn't about making women strong. Women are already strong. It's about changing the way the world perceives that strength.

– G. D. Anderson

উদ্দালক ভরদ্বাজ

জোয়ান কাইগার (১৯৩৪-২০১৭)

কবিতা-জীবন: পাঁচ বছর বয়সে প্রথম কবিতা, ক্যালিফোর্নিয়ার লঙ বিচ শহরের নেপলস প্রাথমিক স্কুল-পত্রিকায়। সান্টা বারবারার হাই স্কুলের পত্রিকায় ফিচার লেখা, কবি লেলাণ্ড হিকম্যানের সহায়তায়। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিতা ও দর্শন নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে ১৯৫৭ সালে সান ফ্রান্সিস্কোতে এসে পৌঁছনো, যেখানে তখন গিন্সবার্গের হাউল গ্রন্থের অশ্লীলতা নিয়ে বিতর্ক চরমে। গ্যারি স্নাইডারের হাত ধরে শহরের কবিকুলের সাথে পরিচয়, ইস্ট-ওয়েস্ট হাউস নামে একটি যৌথ আবাসনে, যেখানে পরিচয় হয় জেন মাস্টার শুনরিউ সুজুকি রোশির সাথেও। পরিচয় ও পরিণয় গ্যারির সাথেও, ১৯৬০ সালে, জাপানের কোবে শহরের আমেরিকান কনসুলেটে। জাপানের কিয়োটো শহরে চার বছরের বিবাহিত জীবনে, কবিতা লেখা, ফুল-সাজানো, বৌদ্ধধর্ম চর্চার পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহ করতে করেছেন ইংরেজির শিক্ষকতা এবং জাপানী চলচিত্রে ইংরেজি-ভাষী চরিত্রে অভিনয়ও। ১৯৬৪ সালে কাইগার ফিরলেন সান ফ্রানসিসকো শহরে। শুরু হয়ে গেলো পুরোদমে লেখা, কবিতা পাঠ ও বার্কলির কবিতা উৎসবে যোগদান। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হল প্রথম কাব্যগ্রন্থ The Tapestry and the Web আর দ্বিতীয় বই, Places to Go, ১৯৭০-এ। ১৯৬৬ সালে গ্যারির সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ শেষে পাড়ি দিলেন ইউরোপ, জ্যাক বয়েসের সাথে। মাঝে কিছুদিন নিউ ইয়র্ক। তারপর দুজনেই ফিরলেন আবার সান ফ্রানসিসকোয়। ১৯৬৯ সালে দুজনে মিলে জমি কিনলেন বলিনাসের শহরতলীতে, গ্রামীণ জীবন উদযাপন করবেন বলে। সাত বছর পরে কলোরাডোর বোলডারে নারোপা ইন্সটিটিউটে এলেন এবং, আলেন গিন্সবার্গ এবং আন ওয়াল্ডমানএর সাথে, বিশ্ববিশ্রুত ব্ল্যাক মাউন্টেন কলেজের আদলে প্রতিষ্ঠিত Jack Kerouac School of Disembodied Poetics এর কাজে যোগ দিতে। এখনো এই কলেজ কাউন্টার কালচারের সব চেয়ে বড় মঞ্চ যেখানে এসে বিট মিশেছে বৌদ্ধধর্মস্রোতে। ১৯৭৮ সালে এখানে পড়াতে পড়াতেই পরিচয় হয় কানাডাবাসী ডোনাল্ড গুরাভিচের সাথে, যার সাথেই তারপর পাকাপাকি ভাবে থাকতে শুরু করেন বলিনায় ফেরত গিয়ে। বলিনার Ocean Wind Zendoতে বসতেন কাইগার শেষ দিন পর্যন্ত।

জোয়ানের কবিতা:

জোয়ানের কবিতা খুব জীবন্ত, সহজেই ছোঁয়া যায়। কখনো সেই কবিতা জীবন থেকে নেওয়া খণ্ডচিত্র, কখনো বা প্রতিদিনের মানুষের সঙ্গে কবির সাক্ষাতের বিবরণ। আর এই অভিজ্ঞতার বর্ণনার সাথে মিশে থাকে বৌদ্ধ দর্শনে কাইগারের গভীর জ্ঞান, তৈরি হয় অব্যর্থ ছবি, শক্তিশালী ভাবনা। পঞ্চাশের আমেরিকার বস্তুবাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধের জীবনবোধ নাড়া দিয়েছিল কমবেশি সব বিট কবিকেই। বিট কবিদের “উন্মুক্ত পথ, উন্মুক্ত কবিতা” স্লোগানের সাথে খাপে খাপে মিশে গেছিল বৌদ্ধধর্মের শিক্ষায় “অসীমের দরজা, জীবনের পথে” এই বোধটুকু। কাইগারের কবিতায় তাই এই বোধ-ই বার বার ফিরে এসেছে। তাঁর কবিতার পরতে পরতে মিশে আছে বুদ্ধের বাণী, নেটিভ আমেরিকান ঐতিহ্য, সাইকেডেলিকও।

বুদ্ধের বাণীর সন্ধানে গেছেন জাপান এবং ভারতে। সেই যাত্রার দিনলিপি লিখে রাখতেন, যাত্রার সাথীরা জানতেন না সে কথা, কিন্তু পরবর্তীকালে সেই ডায়েরী প্রকাশের পর হয়ে ওঠে বিটদের সন্ধানী জীবনের এক অমূল্য দলিল।

তদানীন্তন ভারতের ও জাপানের একটা সমাজচিত্রও খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় তাঁর শক্তিশালী লেখনীতে। এই জার্নাল লেখা ছিল জীবনভরের অভ্যাস। জার্নাল থেকে উঠে আসত বহু কবিতাও। একটু নিরস অথচ বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু তীক্ষ্ণ এই সব কবিতা মানুষকে জাগিয়ে তোলে এক সূক্ষ্ম জীবনবোধের আলোয়। কবিতায় মিশে আছে ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাস, প্রকৃতি ও তার বিবর্তনের দলিল, পুরনো নতুন বন্ধুদের আসা যাওয়া, সবটুকু। জীবনের ছোট ছোট অনুভবগুলিই যে সব, সে কথা এই ছোট্ট কবিতাটিতে জোয়ান নিজেরই বলে গেছেন, "আমার মন খুব ছোট্ট কিছু চায়/যেমন একটা ছিমছাম ডিনার/বিরাট সব আশা-প্রত্যাশায় আমি ক্লান্ত/সেগুলি তো হতেই থাকে জীবনে"।

২০০৬ সালে লাইফটাইম এচিভমেন্ট পুরস্কার পান Small Press Traffic সংস্থার পক্ষ থেকে। বলিনাসের নানাবিধ কার্যক্রমের সাথ এজুক্ত থাকতেন, সম্পাদনা করতেন Hearsay news মানে পত্রিকার, বহু পাঠের আসর সংগঠনের কাজ ছিল তাঁর। উঠতি কবিদের নানা ভাবে সাহায্য করতেন।

কবিতার বই: ২০টির বেশী কবিতার বই বেরিয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য The Tapestry and the Web (১৯৬৫), All This Every Day (১৯৭৫), The Wonderful Focus of You (১৯৭৯), Going On: Selected Poems ১৯৫৮-১৯৮০ (১৯৮৩), Just Space, poems ১৯৭৯-১৯৮৯ (১৯৯১), Again: Poems ১৯৮৯-২০০০ (২০০১), As Ever: Selected Poems (২০০২), and About Now: Collected Poems (২০০৭)। এ ছাড়া তাঁর প্রকাশিত গদ্য সংগ্রহ Strange Big Moon: Japan and India Journals ১৯৬০-১৯৬৪ (১৯৮১) হয়ে উঠেছে বিট আন্দোলনের এক সজীব স্মারক।

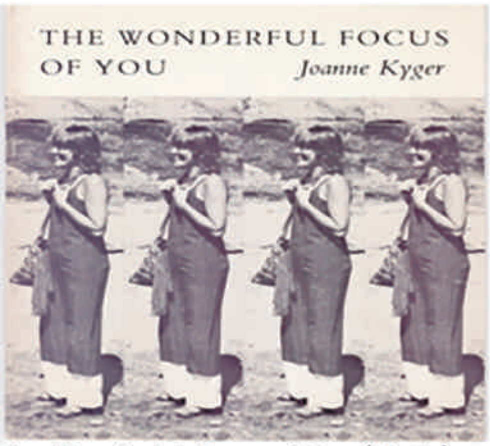

The Wonderful Focus of You (১৯৭৯)

As Ever (২০০২)

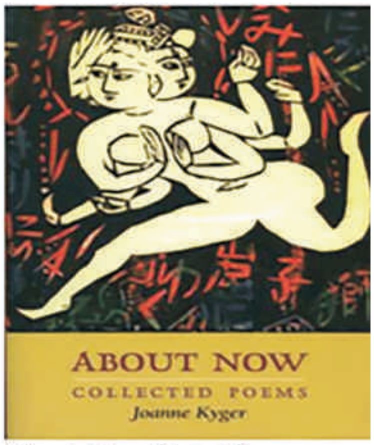

About Now (২০০৭)

On Time (২০১৫)

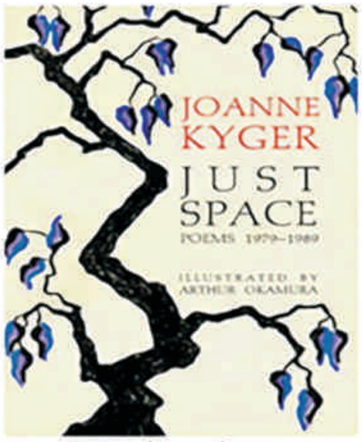

Just Space (১৯৯১)

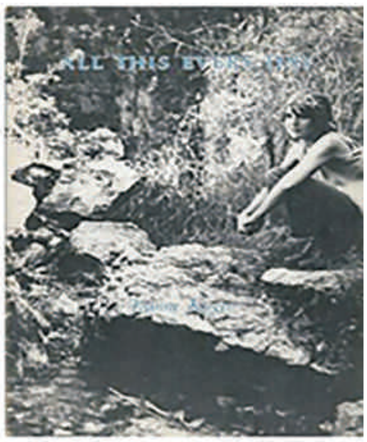
All This Every Day (১৯৭৫)

অনূদিত কবিতাগুলি

Your heart is fine

Your heart is fine feeling the widest
possible empathy for the day and its inhabitants

Thanks for looking at the wind
in the top of the eucalyptus
dancing like someone you know
well 'I'm here I'm here I'm here!'

The wind picks up
a rush of leaves waving

wildly for your understanding
apple, plum, bamboo
rooted and flourishing
next to your home
in the air awake

without defect

তোমার হৃদযন্ত্র ঠিক আছে

তোমার হৃদয়ে কোন রোগ নেই, এই যে তুমি
সম-অনুভবে ঝংকৃত হচ্ছ এই দিন ও
তার অধিবাসীবৃন্দের সঙ্গে

ধন্যবাদ তোমায়, এই যে তাকালে তুমি
ইউক্যালিপটাসের মগডালের পাতাগুলোর দিকে
নেচে চলেছে যারা, অলীক হাওয়ার তালে তালে
"আছি আমি, এই তো আমরা, জ্যান্ত, জীবন্ত!"

দখিনা হাওয়া উড়িয়ে নিল, এক ঝাঁক ঝরা পাতার ঢেউ
হাত নাড়ছে ওরাও, দুরন্ত আবেগে, টুপি দুলিয়ে
একটু ঝুঁকে, সম্ভ্রম জানাচ্ছে, চিনেছ যে ওদের তুমি
সে কথা জেনেছে

আপেল, প্লাম, বাঁশগাছ, ওরাও
শিকড়ে মজবুত, তীব্র, সতেজ,
তোমার উঠোনের পাশে
মৌসুমি হাওয়ায়,
কোন ভুল নেই কোথাও
কোন গ্লানি নেই

Influences in Poetry

Dream:

In a room getting ready for a party
with Dotty,
Ducan MacNaughton comes in and says
'Stephen Rodefer is on his way here to kill you!
You'd better hide.'
We run to the bathroom
and lock the door.
Come to think of it
Duncan looks pretty strange himself.
'There's only room for one
at the top of the steeple'
- Robert Frost

কবিতার প্রেরণা

স্বপ্ন:

পার্টিতে বেরবো, সেজেগুজে তৈরি হচ্ছি
ডটির সাথে
হঠাৎ ডানকান ম্যাকনটন এসে বলল
"শুনলাম স্টিফেন রদাফার এখানে আসছে
তোমাদের খুন করতে...
বাঁচতে হলে লুকিয়ে পড়ো।"
আমরা দৌড়ে বাথরুমে ঢুকে
দরজা এঁটে বসে রইলাম।
ভেবে দেখতে গেলে ডানকানের নিজের
চেহারাটাও কিন্তু বেশ অদ্ভুত
"গির্জের চুড়োর ঘরে তবু একজনই আঁটবে তো"
যেমন রবার্ট ফ্রস্ট বলেছেন

You know when you write

You know when you write poetry you find
the architecture of your lineage your teachers
like Robert Duncan for me gave me some glue for the heart
Beats which gave confidence
and competition
to the Images of Perfection

. . . or as dinner approaches I become hasty
do I mean PERFECTION?

তুমি জানো যখন তুমি লেখো

তুমি জানো, কবিতা লেখার সময়ই একমাত্র সময়, যখন তুমি
অবহিত হও, হতে চাও, তোমার বংশানুক্রম, ঐতিহ্য, পরম্পরা
ইত্যাদি প্রসঙ্গে। ক্রমশ স্পষ্ট হয় ঋণের বোঝা, দায়বদ্ধতাও ...
যেমন রবার্ট ডানকান, আমার ক্ষেত্রে, উনিই দিয়েছিলেন
ভাঙা মন জুড়ে দেওয়ার আঠা
বিটের দল, দিল আত্মবিশ্বাস, কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বী
মনোভাবও হয়ত, উৎকর্ষ অর্জনের,
নিখুঁত লেখার...

কথাটা নিখুঁতই হবে তো! নাকি ডিনারের সময়
হয়ে এল বলে, তাড়াতাড়িতে লিখলাম
বলতে চাই আর কিছু?

My mother

Picked me from a Siennese fresco
I was riding a white horse
and wearing a red-scarlet gown
Placed on my head was a small black crown
and my yellow hair was falling down

I had several attendants
My face was serene
A young beggarman attired in blue
held my reins for an instant
the street was cobbled
nearby was a green vine
I live here now

আমার মা

আমাকে তুলে এনেছিলেন একটি সিয়েনিজ ফ্রেস্কো থেকে
একটা সাদা ঘোড়ায় সওয়ার ছিলাম আমি
পরনে টকটকে লাল গাউন
মাথায় পরানো ছিল একটা কালো মুকুট
হলুদ চুল ছড়ানো পিঠের ওপরে

আমার আশেপাশে সহিস সান্ত্রি পেয়াদা বরকন্দাজ
কিন্তু আমার মুখে একটা শান্তির প্রলেপ
নীল পোশাক পরা এক যুবক ভিখিরি এসে এইমাত্র
ধরেছে লাগামটা
শানবাঁধানো, কেল্লার প্রধান সড়ক
কাছেই একটা সবুজ লতানে গাছ...
আমি এখন এখানেই থাকি

Night Palace

'The best thing about the past
is that it's over'
when you die.
you wake up
from the dream
that's your life.

Then you grow up
and get to be post human
in a past that keeps happening
ahead of you

রাত্রির প্রাসাদ

অতীত ব্যাপারটা খুব মজার
মৃত্যুর সাথে সাথে সেও শেষ।
কারণ, জেগে উঠছ তুমি তখন
স্বপ্ন ভেঙে জীবনের
এরই পর উত্তরণ তোমার
ক্রমশ বীতজন্ম, আগুয়ান তুমি
পৌঁছবে আর এক অতীতে, যা কিনা
দানা বাঁধছে,
ঘটে চলেছে
এখন,
তোমার সামনে।

সুত্রপঞ্জি

1. Lenore Kandel Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Lenore_Kandel
2. Poems and Prose Lenore Kandel: Article on The Fiend website: https://thefiendjournal.wordpress.com/2014/02/17/lenore-kandel-poems-and-prose-6/
3. Lenore reading her poem at a Joy band concert in 1976 - Winterland - San Francisco, CA: https://youtu.be/Qx7j9SKhta8
4. Lenore Kandel Essay on alchetron website: https://alchetron.com/Lenore-Kandel
5. Joanne Kyger Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Joanne_Kyger
6. Joanne Kyger Poetry foundation: https://www.poetryfoundation.org/poets/joanne-kyger
7. Joanne Kyger Poets.org: https://poets.org/poet/joanne-kyger
8. Women of The Beat Generation: MJF Books, New York, 1996; Editor: Brenda Knight
9. The portable beat Reader: Penguin Books, 1992; Editor: Ann Charters
10. The Beat Book: Writings from the Beat generation, 2007; Editor: Ann Waldman
11. Collected Poems of Lenore Kandel, North Atlantic Books, 2012
12. Beat Voices An anthology of Beat Poetry, Henry Holt & Company, New York, 1995; Editor: David Kherdian

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

লিপির দিনলিপি

লিপি অটো থেকে নেমে খুব হুড়োহুড়ি করে কাটল টিকিটটা। এক্ষুনি ট্রেন আসবে। এটা মিস করলে হবে না। ঠিক চারটেয় টালিগঞ্জে পৌঁছতে হবে। নাহলেই কল টাইম পেরিয়ে যাবে, স্যারের বকুনি খেতে হবে। টিকিট কেটে খুব দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল ও। প্ল্যাটফর্মে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

"বাঁচা গেছে। না ট্রেন এখনো যায়নি।" মোবাইলটা বার করে টাইম দেখতে দেখতেই ঘোষণাটা কানে এল।

"যাত্রীগণকে জানানো হচ্ছে,এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে থ্রু গাড়ি যাবে। আপনারা সাবধান থাকবেন।"

বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকে যায় ওর। আবার থ্রু ট্রেন ? ভাবতে ভাবতেই ট্রেনটা চোখের সামনে দিয়ে হু হু করে বেরিয়ে যায়। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার যেদিনই ওর কল টাইম থাকবে, সেদিনই এইসব ঝামেলা শুরু হবে। ঠান্ডাটা ভালো পড়েছে। পেছনের বেঞ্চের এক কোণায় বসে মোজাটা পায়ে গলিয়ে নেয় ও। ট্রেনের টাইম হয়ে গিয়েছে। যেকোন মুহূর্তে এসে হাজির হবে। ব্যাগে মোবাইল বাজছে। বাবলু করছে। ফোনটা তাড়াতাড়ি ধরে ও।

"হ্যালো, তুই কোথায় ?"

"ও হাওড়া পৌঁছে গেছিস ? আচ্ছা। না না ট্রেন ঢোকেনি এখনো। ঠিক আছে। রাখছি।"

বাবলু হাওড়া পৌঁছে গেল ! অথচ ও এখনো ট্রেনেই উঠল না। সবটাই সুকুমারের জন্য। শেষ মুহূর্তেও ফরমাস। "লিপি, তুমি কোথায় ?"

"কেন ?"

"আমার হলুদ সোয়েটারটা দেখতে পাচ্ছি না।"

"অন্য একটা পরে নাও। পরে খুঁজে দেব।"

"না, ওটাই লাগবে। ওটা বেশ হাল্কা মত আছে। বেলায় রোদ্দুর উঠে যায়। অন্য কিছু পরলে গরম করবে।"

"আচ্ছা দেখছি।"

কথা বাড়িয়ে লাভ কি? ছোট্ট একটা ঘর, বারান্দা। একটা আলমারি, একটা তোরঙ্গ, একটা আলনা। না খোঁজার কী আছে ? খুঁজবে না। রান্নার কাজে হাজার বললেও হেল্প করবে না। সব লিপির ঘাড়ে। নিয়মিত বাইরে বেরোতে গেলে বাড়িরও একটু সাহায্য লাগে। সেকথা বুঝলে তো। সবসময় হুকুম চলছে। "এটা দাও, ওটা দাও।"

শেষ পর্যন্ত ও ভেবেছে কাজ থাকলে স্যারের ওখানেই থেকে যাবে। পরপর দুদিন কলটাইম থাকলে এভাবে যাতায়াত করা তো সম্ভব নয়। যদিও কথাটা এখনও সুকুমারকে বলে উঠতে পারেনি। শুনলে সুকুমার নির্ঘাৎ আপত্তি তুলবে। তবে সেটা খুব একটা পরোয়া করেনা ও। সুকুমার ইলেকট্রিকের কাজ করে। বেশ কিছুদিন ধরেই কাজকর্মে মন্দা চলছে ওর। সুকুমার বলে, "অনেক নতুন ছেলে লাইনে ঢুকেছে জানিস। আমার থেকে কম রেট নিচ্ছে বোধহয়। আমাকে পুরনোরাই ডাকছে না। তো নতুন !" সত্যি, ইদানিং সুকুমারের আয় ভীষণ কমে গিয়েছে। বাড়িভাড়া,

ইলেকট্রিকের বিল, মুদির মাসকাবারি টাকা, বাজার খরচ, কিকরে উঠবে বুঝতে পারছে না লিপি। এছাড়াও লোক-লৌকিকতা, যাতায়াতের খরচা, এসব তো আছেই। প্রতিমাসেই টানাটানি। বাধ্য হয়েই ওকে মাঠে নামতে হয়েছে।

বাবলু থাকে কোন্নগরে। নানারকম কাজের ধান্দাতে ওর সঙ্গে আলাপ। দিদি বলে ডাকলেও ওর প্রতি বাবলুর একটা চোরা টান বরাবরই টের পায় ও।

তবে ওর হাবভাব নিয়ে লিপি খুব একটা ভাবে না। সুকুমারের সঙ্গে বিয়েটাও ঠিক করেছিল দিদি জামাইবাবু। একটু ঝকঝকে ভাব আছে বলে ওর দিকে পুরুষমানুষদের সবসময়েই একটু নজর থাকে। তাই এসব অনেকটাই গা সওয়া। ছোট থেকেই একটা বিষয় ওর মাথায় ঘোরে, সেটা হল কিভাবে আরেকটু ভালো থাকবে। মোটামুটি সাজানো ঘরদোর, একটা ফ্রিজ, টিভি, ঘোরা বেড়ানোর জন্য দুচাকার গাড়ি, ব্যস এইটুকু। এর বেশি ওর চাওয়া পাওয়া নেই।

একেবারে অর্ডিনারি ভাবে টুয়েলভ পাস করার পর বেশ কিছুদিন মায়ের অসুখের জন্য বাড়িতেই বসেছিল ও। মা মারা যেতে বিভিন্ন প্রাইভেট অফিসে কাজের জন্য ধর্ণা দিতে শুরু করে। সম্বল বলতে ওই টুয়েলভ পাসের সার্টিফিকেট আর মোটামুটি দেখনসই একটা চেহারা। তখনই বাবলুর সঙ্গে আলাপ। ওর চেষ্টাতেই একটা সোনার দোকানে সেলস গার্লের চাকরিতে ঢোকে লিপি। কাজটা অবশ্য বেশিদিন করতে পারেনি। মাইনেটা মন্দ ছিল না। কিন্তু কর্মচারিদের সঙ্গে মালিকের বা তার ভাইয়ের চরম দুর্ব্যবহার একেবারেই অসহ্য লাগত ওর। মাঝেমাঝে ওদের বাড়ির একমাত্র বংশধর আসত দোকানে, বাবা বা কাকার অনুপস্থিতিতে। তার অতিরিক্ত মনোযোগও চিন্তার কারণ হয়েছিল। সে এমন তাকাত, যেন জামাকাপড় ভেদ করে সবটা দেখতে পাচ্ছে। মাঝেমাঝেই নিজের চেম্বারে ডেকে পাঠিয়ে খোশগল্প শুরু করত। তখন অন্য কর্মচারিদের বাক্যবাণ শুনতে হত। কিছুটা ওই মালিকের ছেলের কারণেই কাজটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় ও। সুকুমারের রোজগারটার ওপর ভরসা করা গেলে হয়ত দু-একটা নিচু ক্লাসের ছেলেমেয়ে পড়িয়ে ম্যানেজ করে নিত। এভাবে আবার পয়সার জন্য কলকাতায় ডেলিপ্যাসেঞ্জারি শুরু করত না।

চিন্তা করতে করতেই সিগনালের দিকে তাকিয়েছিল। এবার গাড়ি আসছে। থামতে থামতে গেলেও ট্রেনটা ঠিক টাইমে পৌঁছে দিল ওকে। প্রায় পৌনে চারটে নাগাদ পৌঁছে গেল ও। স্যার স্টুডিওতে পাঠানোর আগে প্রতিদিনই ওদের একটা বাঁধানো খাতায় সই করান। উনি ওর মতো অনেককেই সিনেমা বা সিরিয়ালের শ্যুটিং এ সাপ্লাই দেন। সিনেমা বা সিরিয়ালে ওদের রোল হল এক্সট্রার। ভিড়ের দৃশ্যে বা রেস্টুরেন্টে যে অতিরিক্ত আর্টিস্ট লাগে, ওরা সেই কাজটাই করে। কখনো কখনো দু-একটা কথাও বলতে হয়। কখনো আবার একেবারেই বোবা কালা। তবু যখন স্যার "আর্টিস্ট" বলে ওদের উল্লেখ করেন বেশ অহঙ্কার হয়।

কথা বললে যে টাকা পাওয়া যায়, কথা না বললে সে টাকা পাওয়ার প্রশ্ন নেই। ও নতুন ঢুকলেও চেহারার জন্য একটু বেশি নজরে এসে গিয়েছে। গুরুত্ব পাচ্ছে,রোজগার ও বাড়ছে। পয়সা বেশি পাওয়ার জন্য অনেকেরই চোখ টাটাচ্ছে। তবে এসব ও পাত্তা দেয়না। কাজ ছাড়ার কথাও ভাবেনা। "কালো মেঘে ভরল আকাশ" সিরিয়ালটায় বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেছে। ওটা যেদিন দেখাবে, বাপেরবাড়িতে বউদিকে খবর পাঠাবে। তবে স্বপ্ন একটাই। স্যার বলেছেন, এভাবেই কেউ কেউ নাকি টিভিতে বড় রোলে চান্স পায়। দেখা যাক ওপরওলা কী করেন।

সেটের একপাশে দাঁড়িয়ে এসবই ভাবছিল । চমক ভাঙল বাবলুর গলার আওয়াজে ।

"লিপিদি রেডি থাকো। এর পরের শটেই তোমাকে লাগবে।" রুমাল দিয়ে অভ্যেসবশত মুখটা একবার মুছে নিয়ে এগিয়ে যায় ও।

এবারের দৃশ্যটা ছিল ভিড়ের। নায়িকা বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, পথে এ্যাক্সিডেন্ট। গাড়ির ধাক্কায় নায়িকা মাটিতে কুপোকাত। চারপাশে ভিড়। সেখানে গলা বাড়িয়ে বলতে হবে, "ওমা,একে তো আমি চিনি। এ তো বোসেদের বাড়ির ছোট মেয়ে।"

নায়িকার পড়ে যাওয়াটা কিছুতেই স্বাভাবিক হচ্ছিল না । তাই পর পর অনেকগুলো শট নিল ওরা । এর পরেও আরো দৃশ্য আছে । এখন ব্রেক । একপাশে বসে চিকেন স্যান্ডুউইচে কামড় দিচ্ছিল ও । কফি নিয়ে এগিয়ে এসে বাবলু বলল, "শটটা বেশ ভালো দিয়েছ লিপি ।"

"লিপি ? আমাকে তো লিপিদি বলতে ।"

"আরে, এবার থেকে দিদি আর বলব না । নাম ধরে ডাকটাই প্র্যাকটিস্ করছি । কেন বলত ?"

"কেন ?"

"দিদি বললে তোমার বয়স বেড়ে যায় । এ লাইনে শুধুমুধু কেউ বয়স বাড়ায় না ।"

হাসি পায় ওর । হতচ্ছাড়া ! এভাবেই এগোবে ভাবলে খুব ভুল করছে ও । বাবলুর ওকে চিনতে এখনো বাকি আছে । থাক বেশি ঘাঁটিয়ে কাজ নেই । এ লাইনে ওই তো ভরসা । এবারের শটে ড্রেস চেঞ্জ করতে হবে । এগোতে যেতেই বাধা পায় । সামনে এসে দাঁড়ান এক ভদ্রলোক । লম্বা চওড়া শান্ত চেহারা ।

"আপনাকে আমার অন্য একটা সিরিয়ালে লাগবে । ঠিকানাটা বলবেন ।আমার লোক যোগাযোগ করে নেবে ।"

নিজের বুকের ঢিপঢিপ শব্দটা শুনতে পাচ্ছিল ও । এই কী সেই সুযোগ? তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, "আমি থ্রু এজেন্সী এসেছি । ওদের ঠিকানাটাই বলছি কেমন ।"

# #

বাসে ফিরতে ফিরতে ছোট আয়নায় নিজের মুখটা দেখছিল ও । নাকটা তেমন চোখা না হলেও নেহাত বোঁচাও নয় । চোখের পাতা ভারি,বড় বড় পলক । ঠোঁটে হাল্কা লিপস্টিক ছুঁইয়েছে । তার ওপর লিপগ্লস । সব মিলিয়ে মুখটা এমন জ্বলজ্বল করছে, সবার চোখে পড়তে বাধ্য । এমনকি কাজ সেরে ফিরছে অথচ সারা মুখে একটুও ক্লান্তির ছাপ নেই ।

আজ গিয়েই স্যারকে জিজ্ঞাসা করেছিল ও, "কোন ফোন এসেছে ?"

"ফোন ? কী ব্যাপারে ?"

"সেই যে আপনাকে বলেছিলাম না, একজন ভদ্রলোক খবর দেবেন বলেছিলেন ।"

"ও হ্যাঁ । না কেউ কোন খোঁজ করেনি তো ।"

এই নিয়ে চার সপ্তাহ হয়ে গেল । ভদ্রলোক ফোন করলেন না তো । বাবলুকে ও বলেছিল কথাটা, বাবলু পাত্তাই দিল না । উলটে বলল "অমন আমাকেও কতজন বলেছে, তারপর আর কোন খবর দেয়নি ।"

সেদিন উনি কথাটা বলার পর ও যখন ফিরে আসছে, বাবলু ওকে ডেকে বলেছিল, " লিপি তুমি জানো উনি কে ?"

"কে ?"

"বিখ্যাত পরিচালক রবিন রায় । নতুন ছেলেমেয়েকে সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে ওনার খ্যাতি অখ্যাতি দুইই আছে ।"

"কী রকম ?"

"নায়িকা লিলি রায়কে উনিই তো প্রথম ওনার ছবিতে নায়িকা হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।"

সেদিন বাড়ি ফেরার সময় ও একবাক্স দরবেশ কিনে নিয়ে গিয়েছিল। দরবেশ খেতে সুকুমার খুব পছন্দ করে।

দরবেশ খেতে খেতে সুকুমার জানতে চেয়েছিল "হঠাৎ মিষ্টি ! কী ব্যাপার ?"

ও কিছু বলেনি। কোন কাজ না হলে বেশী বলাবলি করা ওর একদম না পছন্দ। ভাগ্যিস বলেনি। বললে তো ও বেশ মুস্কিলে পড়ত।

সুকুমারের মুখটা দরবেশ চিবোবার সময় কেমন তৃপ্তিতে ভরে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে শ্যুটিং-এ ভালোমন্দ খাওয়ার সময় ওর সুকুমারের মুখ মনে পড়ে। কিন্তু তখন এত খিদে পায়, না খেয়ে নিয়েও আসতে পারেনা। প্রেমের মত বিলাসিতার জন্য ওর সময় নেই। তবে মাঝেমাঝে মনে হয় ওর যে ভাল কিছু খেলে সুকুমারের কথা মনে হয়, এটাই কি ভালোবাসা ?

বাড়িতে সকালে অনেকগুলো কাজ। তার মধ্যে একটা ঠাকুরকে জল বাতাসা দেওয়া। বিয়ের আগেও নিজের ঠাকুর ছিল ওর। পুজোর মেলা থেকে কেনা দু একটা ছবি। মাকেও দেখেছিল ঠাকুরকে বিড়বিড় করে অনেক কথা বলছে। ও জানতে চেয়েছিল "কী বলছ মা ?"

মা বলেছিল, " নিজের দুঃখের কথা বলছি।"

ও তখন অনেকটা ছোট। বলেছিল, "ঠাকুরকে বলছ, ঠাকুর কী শুনতে পায়। কানই তো নেই।"

"মা বলেছিল, কান থাকলেও সবাই শোনেনা। তোর বাবাকে তো কবে থেকে বলছি আমার বুকে বড্ড কষ্ট হয় আজকাল। কেমন যেন ধড়ফড় করে। তোর বাবা তো কথাটায় কানই দিল না। তাই আমার ঠাকুরকে সবকথা বলি। শুনুক না শুনুক, বলুক না বলুক আমার অন্ততঃ কোন আফশোস হয়না।"

মা বেশিদিন বাঁচেনি। হার্টফেল করে মারা যায়। মা মারা যাবার পর বাবা বিড়বিড় করে বলত, "আমিই মেরেছি তোর মাকে। একেবারে বিনা চিকিৎসায় চলে গেল। কতবার বলেছে বুকের কষ্টের কথা। আমল দিইনি। নাহলে হয়ত ...।"

ও বুঝেছিল শুধু বাবা নয়, ভগবানও কোন কথা শোনেন না। তবু ও মায়ের মতই পুজো করে, বিড়বিড় করে ভগবানকে মনের প্রাণের সব কথা বলে। ওই রবিন রায়ের কথাও বলেছে। কিন্তু ফোনটা এখনও এলো না।

আসলে সবই কপাল। নাহলে সুকুমারই বা এমন বোকা কুঁড়ে হবে কেন ? শুধু কুঁড়ে ? মেজাজ ও টনটনে। সেলসের অমন ভালো চাকরিটা শুধু বসের সঙ্গে ঝগড়া করেই ছেড়ে দিল। কি না "উনি আমাকে অপমান করেছেন।" হাঁ হয়ে গিয়েছিল ও। এই বাজারে অমন চাকরি কেউ তুচ্ছ মান অপমানের দোহাই দিয়ে ছাড়ে ?"

তবে এখন আর ওসব ভাবেনা। কেবল নিজে কি করে এই "এক্সট্রা" নামটা ঘোচাবে সেই কথাই ভাবে।

রবিন রায় সম্বন্ধে ওই স্টুডিওটায় খোঁজ খবর করেছিল। ওরা কেউ বলতে পারেনি উনি আবার কবে আসবেন। তাই ভাগ্যের হাতে বাকি ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে আছে আপাতত।

আসলে অনেকদিন এ লাইনে কাজ হয়ে গেল। এতদিনে, একটা কথা ও ভালই বুঝেছে, ভাগ্য ছাড়া কিছু হবার নয়।

# #

আরো কিছুদিন লেগে গেল ওর ভাগ্য খুলতে। সেদিন স্টুডিওতে চুপচাপ বসে চিকেন স্যাণ্ডউইচে কামড় দিচ্ছিল। শ্যুটিং জোনে এই একটা বেশ মজার কান্ড ঘটে। পার্ট যাই হোক সবাইকে ভালো টিফিন দেয় ওরা। পয়সা যাই দিক খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কোনো কঞ্জুসি করেনা। ঠিক সেইসময়েই ও দেখল ওই ভদ্রলোক একটু তাড়াহুড়ো করেই কোথাও যাচ্ছেন। স্যাণ্ডউইচের বাকিটা মুখে চালান করে ও প্রায় ছুটেই ধরল ওনাকে।

"স্যার, আপনি আমায় কাজ দেবেন বলেছিলেন।"

"আপনাকে ? ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। কাজ একটা আছে। আপনি কাল বরং "মর্ডান স্টুডিওয় চলে আসুন। শার্প এগারোটায়। ওখানেই বাকি কথা হবে।"

সকালে ট্রেন বাস পালটে ওই সময়ে হাজিরা দেওয়া সোজা কথা না। তবু থেকে যাওয়ার কথা ভাবল না ও। তাহলেই স্যারকে সব জানাতে হবে। আগে রোল পাক তো, তারপর দেখা যাবে।

পরের দিন ভোর ভোর উঠে, সব কাজ সেরে বেরিয়ে পড়ল। সুকুমার তখনও বিছানায় শুয়ে। পৌঁছেও গেল এগারোটার আগেই।

স্টুডিওর গেটের বেঞ্চিটায় অপেক্ষা করতে করতে চারটে বাজল। আর্টিস্টের লিস্টে ওর নাম নেই। তাই খাবারও পায়নি ও। খিদেয় তেষ্টায় ঢুলতে ঢুলতে কখন যে ঘুমিয়ে গিয়েছে। ঠিক পাঁচটায় এলো রবিন রায়ের গাড়ি। ও হাঁটা লাগালো সেই দিকে। বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে। আলো, ক্যামেরা রেডি করা হচ্ছে। লোকজন মেকআপ নিচ্ছে শটে নামবে বলে। ও সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক ওকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। "ও আপনি ? এসে গিয়েছেন ? এক্ষুণি শ্যুটিং শুরু হবে। ওই যে মিছিলটা আসছে না, ওখানে গিয়ে সামনে দাঁড়ান। কী হল দেরী করছেন কেন ? যান।"

মিছিলে দাঁড়াতে হবে ? তেমন কিছু রোল নয় তাহলে ? সেই এক্সট্রা ! একবার ভাবে ও, ফিরে যাবে। তারপর মনে হয় থাক, করাই যাক। না করে লাভ কি ? ওর ফাটা কপালে এর বেশি আর কিছু জুটবে না। এভাবেই যেকটা টাকা আসে।

লিপি পা ঘসটে ঘসটে এগিয়ে যেতে যেতে শুনতে পায়, লাইটম্যান কে উনি ডিরেকসান দিচ্ছেন, "শুনুন এইমাত্র যিনি গেলেন, উনি মিছিলের প্রথমে থাকবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সট্রার রোলে। কিন্তু ওনার মুখে আলোটা ঠিক করে ফেলবেন। মুখটা বেশ প্রমিন্যান্ট তো, কাজে লাগাতে হবে।"

# #

> Well-behaved women rarely make history.
>
> – Eleanor Roosevelt

সুনন্দা বসু

দিগন্তে

ভোর চারটে কুড়ি

আঃ সকালটা কি সুন্দর — মহালয়ার গান ভেসে আসছে। শিউলি তলার ভিজে নরম ঘাসের ওপর অজস্র কমলা-সাদা ফুল ঝরে পড়ে রয়েছে। আজ সাজি উপছে পড়বে আমাদের আর ঠাম্মা খুশী হ'বে খুব। ঠাম্মার গোমড়া মুখে একটুখানি হাসি দেখতে পাবো। আমায় এক্কেবারে ভালোবাসেনা ঠাম্মা যেমন পুপুনকে — যাদুমনি বলে ডাকে — আমাকেতো কখনো ডাকেই না কাছে — সর, দুধ, সন্দেশ কোলে বসিয়ে খাওয়ায় আর আমি দূর থেকে তাকিয়ে থাকি। কেন যে ঠাম্মা আমাকে ভালোবাসেনা কে জানে ? তবে বাবা আমাকে খুব ভালোবাসে। কাল শহর থেকে আমার জন্য কত খেলনা রান্নাবাড়ি আর বই নিয়ে এসেছে — কি মজা, কি মজা . . .

সকাল আটটা

— ''মাসীমা, এবারে আপনার মুখটা ধুইয়ে দিই ?'' — ''না, না, আমি বাথরুমেই যাবো। বাবা এর মধ্যে এতো বেলা হয়ে গেল ... এইতো শুতে গেলাম আমি। আমি কি আবার ভুল বকছি উঃ কি যে হচ্ছে'' — ''ও একটু আধটু ভুল সবার হয় মাসীমা — কালইতো দুপুরে একটু চোখটা লেগে গিয়েছিল আমার চোখ খুলতে মনে হ'ল ভোর সকাল ... ওরকমতো সবারই হয়। চলুন, চলুন বাথরুমে নিয়ে যাই আপনাকে। বাঃ খুব ফ্রেশ দেখাচ্ছে আপনাকে ! রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়েছে, তাই না ।''

সকাল সাড়ে এগারটা

এই বীণা মেয়েটা ভারী ভালো — কেমন হাসিমুখে আমার যত্ন করে — এমন যত্ন আমি শুধু আমার মা'র কাছেই পেয়েছি। তারপর তো সারাজীবন অন্যদের যত্ন করতেই কেটে গেল — ছোটবয়সে বিয়ে হ'য়ে স্বামী, সংসার আত্মীয় পরিজনদের তুষ্ট করতে করতে পৌঁছে গেলাম, আশীর ঘরে। আমার মা-বাবা তো ওঁদের সেবা করার কোন সুযোগ না দিয়ে কবেই চলে গেছেন চিরকালের মতো। কিন্তু আমি কি বীণার মতো ওঁদের সেবাযত্ন করতে পারতাম। সনৎ, আমার স্বামী আমার বাপের বাড়ীর সাথে কোনরকম সম্পর্কই রাখতে চাইতো না। আমি জোর করে ওঁদের সাথে দেখা করতে গেলে ফিরে আসতে হ'ত তাড়াতাড়ি। ওঁরাও আমার এখানে এলে স্বস্তি পেতেন না — তাই বলতে গেলে আমার কাছে ওঁরা খুব কমই এসেছেন। স্বামীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর ছিলাম তাই নিজের শিরদাঁড়াও শক্ত ছিল না। তাছাড়া বীণার যেন অন্যরকম একটা সেবা করার দক্ষতা রয়েছে। কিছু চাইবার আগেই সে সবকিছু হাতের কাছে এগিয়ে দেয় — এটা একটা জন্মগত গুণ আমার মধ্যে সেটা নেই আমি জানি। বীণা আমার জন্য একটা আশীর্বাদের মতো। সে না থাকলে আমাকে নিয়ে আমার ছেলে বৌ কি করত .... একটু শীত শীত করছে ভাবতে না ভাবতেই এই দেখ বীণা এসে আমার গায়ে একটা শাল জড়িয়ে দিয়ে গেল .... একটা পাখী ডাকছে কোথায় যেন ....

দুপুর আড়াইটে

আচ্ছা আজ এই রাস্তাটা এতো নির্জন কেন ? হ্যাঁ, এইতো সেই রাস্তাটা। অন্যান্য দিন কতো ছেলেমেয়ে দলবেঁধে এই রাস্তাটা দিয়ে আসাযাওয়া করে। শালবনের মধ্য দিয়ে, এবড়ো খেবড়ো এই রাস্তাটা আমার খুব প্রিয় — এখান দিয়েই রোজ আমি স্কুলের বাসস্টপে পৌঁছে যাই। এখানেইতো একদিন মিহির, সেই লাজুক, রোগা মিষ্টি চেহারার ছেলেটা আমার হাতে একটা খাম ধরিয়ে চট্ করে পালিয়ে গিয়েছিল .... ওঃ ঐতো সেই বিশাল গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে সে

দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা অমন দুঃখী, দুঃখী দেখাচ্ছে কেন ওর ? আমি তো জবাব দিয়েছি ওর চিঠির .... বলেছি .... এতো কুয়াশা কেন ?

বিকেল চারটে বেজে দশ

''মাসীমা, এবারে একটু উঠে বসুন – আপনার একটু হাঁটা দরকার এবারে।'' ''বীণা, আমায় আজকের খবরের কাগজটা দেবে ?''

''মাসীমা, আপনিতো আজকের কাগজ সকালেই দেখলেন। মনে পড়ছে ?''

''ওঃ তাইতো এখন কটা বাজে ?''

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা

লীলা মেয়েটা আমার ভারী মিষ্টি – আমায় কোনদিন কড়া কথা বলে না – বিরক্ত হয় মাঝে মাঝে যখন আমি সব নিয়ম মেনে চলিনা, যা খাওয়া উচিত তা খেতে চাইনা। কিন্তু কক্ষনো বকে না আমায় আমার ছেলেদের মতো। আমার জন্য ওর এতো চিন্তা, এতো মমতা, যেন ওই আমার মা ! আমাদের ভূমিকা পাল্টে দিয়েছেন যেন পরিচালক ওপর থেকে !

লীলা আমার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর ভারী ভালো লাগছে আমার। এতোদিন তুই কোথায় ছিলি দুষ্টু মেয়ে ? এরা আমায় ঠিক বোঝে না তুই যেমন বুঝিস। কাল রাতে খেতে চাইলুম না দেখে বুবুন আর তার বৌ ভীষণ রেগে গিয়ে আমাকে এতো জোরাজোরি করতে লাগল। তুই থাকলে আমায় তুই সেই হালকা স্যুপটা বানিয়ে খাওয়াতি – তোর দিদার রেসিপি ....

রাত নটা

– ''মাসীমা এবারে একটু ওপাশ ফিরে শোন – আপনার পিঠে একটু লোশন মাখিয়ে দিই, কেমন ? আচ্ছা, আগে এই ওষুধটা চট্ করে খেয়ে নিন্। চুলটা আঁচড়ে দেবো কি ?''

– ''লীলা আঁচড়ে দিয়েছে তো ....

''লীলা ? .... ওঃ আচ্ছা আচ্ছা।

রাত সাড়ে বারোটা

এতো রক্ত কেন ? আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এরা ? মা, মা, তুমি আমার সাথে চলো – সনৎ কে চাইনা – শুধু তুমি শুধু তুমি – এটা কি অ্যামবুলেন্স .... কি বৃষ্টি এই শীতের রাতে .... খুব শীত করছে আমার – যেন আমার হাড়গুলোও জমে গেছে – চারিদিকের দেয়াল, পর্দা সবুজ নীল – ঘরটা কি ভীষণ ঠান্ডা – ডঃ সেন কেন মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছেন ? কাকে বাঁচাতে পারেননি ? কাকে ?

ভোর চারটে দশ

''মাসীমা কি হয়েছে ? কাঁদছেন কেন ?''

– ''আমি ঠিক আছি বীণা। কই কাঁদছি না তো ? ঘুমের ঘোরে চেঁচাচ্ছিলুম বুঝি ? লীলাকে ডাকছিলুম ? জানো, ওরা আমাকে ওর মুখটা পর্য্যন্ত দেখতে দেয়নি। জানিনা ওর মুখটা কার মতো ছিল – আমার মায়ের মতো, না আমার মতো। ন'টা মাস যে আমার অস্তিত্বের সাথে একেবারে মিশে ছিল – তাকে একবার দেখতেও পেলাম না – শুধু কল্পনা করি – বেঁচে থাকলে সে তোমারই মতো হ'ত।

পৃথা ব্যানার্জী

“নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী”

তখন চলছিল নিদারুণ অতিমারী। না, ঠিক এখনকার মত নয়, যখন আমরা অতিমারীর সাথে মানিয়ে-গুছিয়ে ঘর করতে শিখে গেছি। এটা ছিল সেই সময় – যখন আমাদের প্রথমবার দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল। যখন আমরা সবেমাত্র শিখছিলাম অনেকদিন পরে দেখা হলেও বন্ধুদের জড়িয়ে না ধরতে। বাতাসে ভাসমান, অদৃশ্য, অশরীরীদের সাথে আমাদের চলছিল মনের জোরের লড়াই ।

ঠিক সেইরকম মন-কালো দিনে, মন ভালো করার মত গুটি গুটি পায়ে আসছিল রবীন্দ্রজয়ন্তী। আর কয়েকজন বন্ধুরা মিলে ভাবছিল তারা এই অতিমারীকে হারিয়ে দেবে নাচ – গান – কবিতায়। শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবে রবি ঠাকুরকে তো বটেই (যেমন তাদের ছোটবেলায় গোটা বৈশাখ মাস জুড়ে চলতো রবিপুজোর উদ্যোগ) তবে তার মূল কেন্দ্রে থাকবে রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী নারী-চরিত্ররা। সেইরকমটা হয়েও ছিল। একমাস নিরলস পরিশ্রম, অফিস ফেরত নাচের মহড়া, শেষ মুহূর্তের ভুলত্রুটি, মান-অভিমানের পরে – মঞ্চে দাপিয়ে গিয়েছিল ওরা। আজকের লেখায় ফিরে দেখা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট সেই অসামান্য নারী চরিত্রদের, যারা আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। সেদিনের সন্ধ্যায় কলাকুশলীরা তাদের দক্ষতায় ও ভাবে অনুষ্ঠানের এক অসাধারণ রূপ দিয়েছিল ।

আজ থেকে বেশ কয়েক দশক আগে রবি ঠাকুরের লেখনীতে ধরা দিয়েছিল এমন কিছু নারী চরিত্র যারা সেভাবে দেখলে, আমার আপনার ঘরের মেয়েটির মতোই সাধারণ, আবার প্রয়োজন ও পরিস্থিতিতে নিজ নিজ গুণে ও স্বমহিমায় অসাধারণ।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিতে, তার হাতে গড়া, স্বপ্নে বোনা নারী চরিত্ররা আজও সমানভাবে আমাদের ভাবায়, আমাদের প্রেরণা দেয়। তারা ততটাই রক্তমাংসের যতটা আজকের ওই অফিসের প্রেসেন্টেশন সামলে আসা মেয়েটি, বাড়ি ফেরার পথে childcare থেকে ছেলেকে পার্কে ঘুরিয়ে আনে বা ঘরের ওই নীল পর্দার সাথে ম্যাচিং করে কুশন কভার কিনে আনে।

বিমলা – ঘরে বাইরে

১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসটি লিখলেন তখন Nationalist Movement তীব্র। সেই প্রেক্ষাপটে, রবীন্দ্রনাথ বিমলার ছবিটি আঁকলেন, তখন সে এক তেজদীপ্ত রমণী। স্বামী নিখিলের গান্ধী-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ অহিংসা আন্দোলনকে সমর্থন তো সে করে, কিন্তু সন্দীপের স্বদেশী গানেও শিহরিত হয়।

এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে conflicting moment-এ আমরা যাকে পাই, তার এক পা ঘরে আর একটা বাইরে।

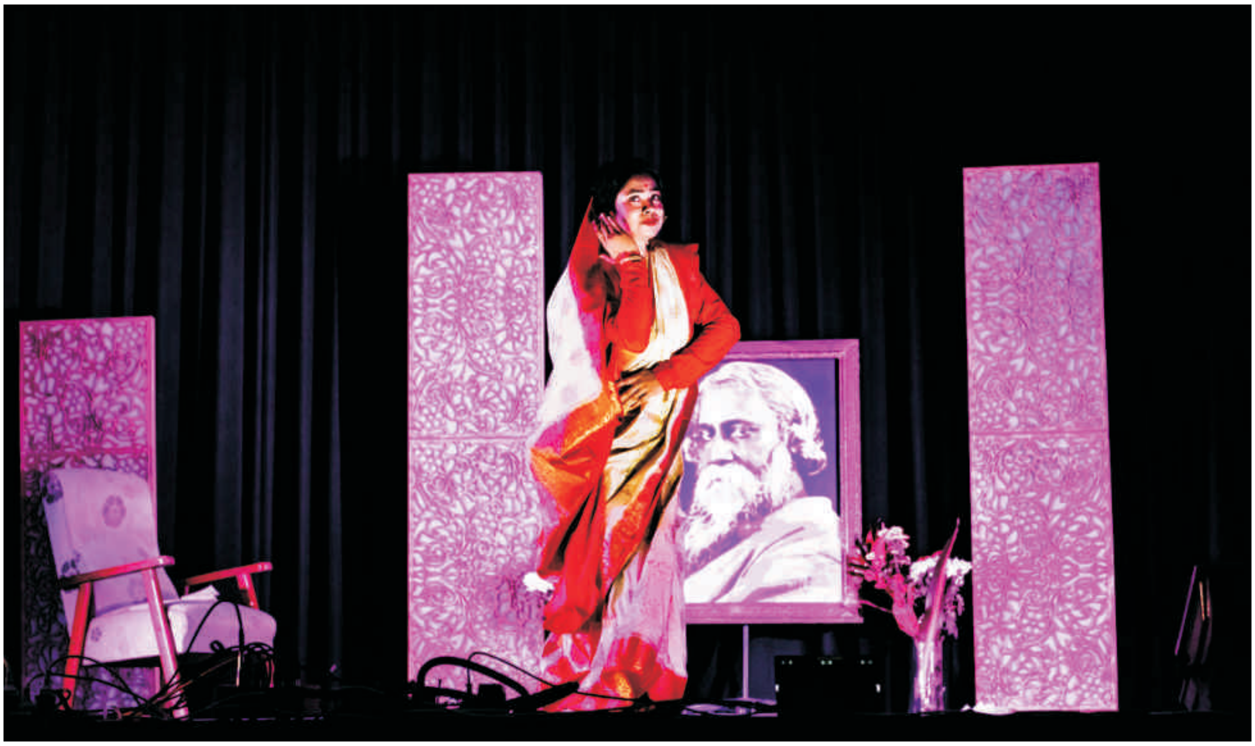

Bimala no longer considers herself only the deities of household fire but the "shakti of motherhood" and the "Shakti of the womanhood" incarnate. Subsequently, becoming the centre of the movement as "Queen Bee".

কুরূপা – চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা-পূরণের গল্প। Gender non-conformityর গল্প, যা আজও ভীষণ ভাবে প্রাসঙ্গিক। মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা, ছিল যুদ্ধবীর এবং সাহসী। সমাজ নারীসুলভ চরিত্রের যে সংজ্ঞা বেঁধে দিয়েছে, তার কোনোটার-ই ধার সে ধারে না। কিন্তু সে স্বাধীন ও স্বচেতন ।

বীর অর্জুনের প্রেমে পড়ার পর সুরূপা অর্জুনের কাছে দাবী করেছিল তার মর্যাদা এবং সমান অধিকার । নারী মুক্তির এ এক অসাধারণ পদক্ষেপ ।

Chitrangada is a conflicted soul trapped at the juncture of feminist, feminism, and female. The dichotomy leads her to rediscover her real self through a journey of wishful desire and in the end, she evolves as…

আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে
সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে
সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে
সহায় হতে,
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
আজ শুধু করি নিবেদন –
আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী ।।

চারুলতা – নষ্টনীড়

নষ্টনীড় উপাখ্যানে, চারুলতা চরিত্রে এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে অন্দরমহলের নিঃসঙ্গতার সাথে এক বুদ্ধিদীপ্ত মননের, যে উড়তে চায় বনের পাখিটির মত। তার ব্যস্ত স্বামী ভূপতির উপেক্ষায় যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, সেখানে হঠাৎ করে ঝলমলে বাতাসের মতো ঢুকে পড়ে অমলের প্রাণবন্ত উপস্থিতি। চারুলতা কি ভালোবেসেছিল অমল কে ? না কি সেটা নারী-হৃদয়ের চিরকালীন খোঁজ এক মানস সঙ্গীর ।

The fact that Charu finally comes into her own, through her writings and found a companion who admired her for her wit and not her looks was a feminist realisation of women's greatest desires – to be seen, to be heard for who they are, not for the outward appearance.

রাধিকা ও সখীবৃন্দ – ভানুসিংহের পদাবলী

যদিও রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর মূল কাহিনী রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে, কিন্তু রাধিকা ও তার সখীদের সম্পর্ক তাকে দিয়েছে এক অত্যাবশ্যকীয় প্রেক্ষাপট। সে শ্রীকৃষ্ণ অভিসারে যাওয়ার পূর্বে প্রেমসজ্জাই হোক বা প্রেমাস্পদের প্রতি ব্যাকুলতা প্রকাশেই হোক, রাধা ভরসা রেখেছে তার সখি ললিতা ও বিশাখার উপর। এ যেন মনে করায় – জীবনের যে সম্পর্ক-গুলো আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি, সেগুলোর পরিপূর্ণ প্রকাশ কিন্তু নির্ভর করে আরো অনেক অনু-সম্পর্কের উপর ।

In this text of Tagore's, we find a great example of sisterhood and celebratory female friendship.

বিনোদিনী – চোখের বালি

আমরা বলেই থাকি রবীন্দ্রনাথের নারীরা তৎকালীন যুগ ও সমাজের থেকে অনেক এগিয়ে। কিন্তু তাদের মধ্যে, চোখের বালির বিনোদিনীর স্পর্ধা, আজও আমাদের বিস্মিত করে। বিনোদিনীর গল্প নিষিদ্ধ ভালোবাসার গল্প। প্রথমে মহেন্দ্র ও পরে বিহারীর দ্বারা পরিণয়ে প্রত্যাখ্যাতা বিনোদিনীর গল্প, জিঘাংসার গল্প। কে বলেছে নারীকে হতেই হবে, ক্ষমাশীলা, সহনশীলা সু-চরিত্রের ধ্বজাধারী ?

Binodini is the story of fallen women. She refuses to fit into the role of a lonely widow, unwilling to forgo her desires. A woman's sexuality is her own to do with as she wants and being absolutely unapologetic about it. Well – that's Tagore's Binodini for you.

প্রকৃতি – চণ্ডালিকা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে সমাজের সেকালীন শ্রেণীব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে, নারীর নিজচেতনার উন্মীলিত হবার কাহিনিটি বুনেছেন। চণ্ডাল-কন্যা হয়েও, প্রকৃতি ভালবেসে ফেলে বুদ্ধ-সন্ন্যাসী, আনন্দকে। সমাজের প্রান্তবর্তিনী হওয়া সত্ত্বেও, কখনও সে দ্বিধায় ছিন্ন ভিন্ন, কখনও সে অনুতপ্ত মায়ের দেওয়া নাগপাশ মন্ত্রের অবলম্বী হওয়ার জন্য, আর কখনো সে আত্মশক্তিতে রিদ্ধ।

In her search for her true self, Prakriti transcends from darkness of social degradation into the light of signifying her own self as women. By offering water to the thirsty monk, it is as if Prakriti has satisfied her own thirst of self-respect, of being acknowledged – for who she is, beyond her class and caste.

মিনি – কাবুলিওয়ালা

রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট সকল চরিত্রের মধ্যে সবচাইতে মন ছুঁয়ে যায় যে চরিত্রগুলো, তাদের মধ্যে অন্যতম কাবুলিওয়ালার মিনি। মিনির সারল্য ও পরদেশী কাবুলিওয়ালাকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা প্রকাশ করে বালিকার সারল্য ও আন্তরীকতা। আব্দুল রাহমানের সুদূর আফগানিস্থানে নিজের মেয়েকে ফেলে আসার দুঃখ দু-হাতে মুছিয়ে দেয় মিনি।

The odd friendship between little Mini and Kabuliwalah lasted the test of time – beyond borders and age difference. Abdul and Mini were both personification of innocence and purity but misfortune does not discriminate between innocent and evil. But what we readers get in the end is an immortal tale of friendship.

লাবণ্য – শেষের কবিতা

শেষের কবিতা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম আলোচিত ও সমালোচিত রচনা। রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার প্রশ্ন তুললেন – প্রেমের পরিণতি কি পরিণয়ে, সবসময়ে ? লাবণ্যের দার্শনিক চিন্তাভাবনা ও বুদ্ধিদীপ্ত মনন উদ্বুদ্ধ করে অক্সফোর্ড ফেরত অমিত রায়কে। অমিত আবেগ প্রবণ, সিদ্ধান্ত নিতে বিরূপ, সেখানে লাবণ্য শান্ত ও স্থির। তাদের মধ্যে গভীর ভালোবাসা ও অন্তরের বন্ধন থাকলেও ধীরে ধীরে লাবণ্য গুটিয়ে নেয় নিজেকে তার গণ্ডীর মধ্যে আর রেখে আসে অমিত-র জন্যে খোলা আকাশ ও তাদের স্বপ্নের জসৎ । মুগ্ধ অমিতও এই সম্পর্কের পূর্ণ মর্যাদা দেয়। গভীর আন্তরিক প্রেম চিরস্থায়ী ও শ্বাশ্বত।

তোমারে যা দিয়ে ছিনু সে তোমারি দান
গ্রহন করেছো যত ঋণী ততো করেছো আমায়
হে বন্ধু বিদায়
লাবণ্য

It is this quality, that elevates Labanya from the pit of predictability to the feisty woman who commands her own narrative.

কিন্তু এত গেল রবীন্দ্রনাথের কাল্পনিক চরিত্কথা। সব চরিত্র কাল্পনিক নয় কিন্তু। কিরকম?

যেমন ধরুন – সারাদিন কাজ সামলে, মেয়েটা যখন শুধুমাত্র নাচতে ভালবাসে বলে একঘণ্টা ট্রেন ধরে আসছে চারুলতাকে রূপ দেবে বলে, বা বাংলায় তেমন সড়গড় না হওয়া মেয়েটা পড়ে ফেলছে “ঘরে-বাইরে” শুধু বিমলাকে চিনবে বলে, বা কড়াইতে ফোড়ন দিতে দিতে মেয়েটা ভাবছে আর কিভাবে প্রকৃতিকে জীবন্ত করে তোলা যায় বা যে মেয়েটা রাত্রিবেলা বিছানায় বিনোদিনীকে কিছুতেই আলাদা করতে পারছে না নিজের থেকে – এরা সকলেই লড়ছে, ভাঙছে, গড়ছে – নিজেদের মত করে। এরা ভুল করছে বারবার, আবার উঠেও দাঁড়াচ্ছে বারবার। আমি দেখেছি। এরা রবীন্দ্রজয়ন্তীর নামে যখন খুঁজে নিচ্ছিল নিজেদের, আমি তখন এদেরকে দেখেছি খুব কাছ থেকে। দেখেছি এরা কেউই দেবী নয়, ভুলত্রুটিতে ভরা, ষড়রিপুর মিশেলে রক্তমাংসের মানবী, আবার এরা সামান্যা-ও নয়। দেখেছি আর ভেবেছি এই যে কথাগুলো বলা হয়নি আগে, সুযোগ পেলেই বলব কখনও।

শুভ্র দাস

কালো কালি ও লাল আপেল

আমার মনে যে এতখানি অবিশ্বাস ছিল জানতাম না। সন্দেহের চোখে বার বার চারিদিকে চাইছি, মুখ তুলে দেখছি আকাশের দিকে – যতক্ষণ চেয়ে থাকা যায় অবশ্য। ক্যাম্পাসে এখন কেবল হাফ প্যান্ট আর মিনি স্কার্টের ভিড়। সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে পড়েছে ছেলেমেয়েরা। অনেকের সামনেই খোলা পড়ে আছে বই কিন্তু চোখ মুখের ভাব দেখলে বোঝা যায় ওদিকে মন কারোরই নেই। প্রথম বসন্তের রোদ গায়ে মাখছে শত শত যুবক যুবতী। আজ কোনো ক্লাশেই ফুল অ্যাটেনডেন্স হবে না। অনেকগুলো ক্লাশ তো মাঠের মধ্যিখানেই চলছে। ছাত্র-প্রফেসর সবার মনই আজ বহির্মুখী। দীর্ঘ শীত পার করে বসন্তের আজ প্রথম দিন।

ভাগ্যিস সোমবার সকালে আমার কোনো ক্লাশই থাকে না, তা না হলে আজ অনেকগুলো মিস হত। ঘুম থেকে উঠতেই এগারোটা বেজেছে। ঘুমের আর দোষ কি ? রাত তিনটে পর্যন্ত পার্কিং লট'এ লিসার পেছনে দৌড়োদৌড়ি করলে কি করে ঘুম ভাঙবে ? উঃ, কাল যে হয়রান করেছে আমায় তা চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। এমনিতেই ভীষণ ছটফটে মেয়ে লিসা, তার ওপর গতকাল রাত্রে ওর মাথায় যেন ভূতে ভর করেছিল। রাত দশটা পর্যন্ত হার্ডিস'এ কাজ করেছে। তার পর এসেছিল আমার ঘরে । দুজনে বসে প্রায় রাত দুটো অব্দি গল্প করেছি। ওর সারাদিনে যত কথা জমে সব আমাকে বলতে হবে। ক্লাশে কি হলো, কোন লোক ওদের দোকানে এসে খাবার অর্ডার দিতে গিয়ে কিরকম ভাবে কথা বললো, কে উদ্ভট প্রশ্ন করলো, ওর মা'র সাথে কি কথাটা হয়েছে আজ, এরকম আরও কত কি। দুটোর পর ওকে যখন ওর গাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্য নামলাম তখনই শুরু হয়ে গেলো ওর পাগলামি। বারান্দায় ফায়ার এলার্ম এর সুইচটা টিপে দেবার জন্য ছটফট করতে লাগলো। অনেক কষ্টে ওর হাত-পা ধরে আটকাতে পকেট থেকে বার করলো একটা লাইটার। লাইটার জ্বালিয়ে বলে এইতো আগুন, হয় আলার্ম বাজাবো নয়তো এক্সটিঙ্গুইসরটা নামিয়ে এইটা নেবাতে হবে। অনেক কষ্টে লাইটার নিবিয়ে ওর পকেটে চালান করে দেবার পর ওর নজর পড়লো নোংরা ফেলার ড্রামটার দিকে। কে নাকি ওটার নীচে চাপা পড়ে আছে। হেল্প হেল্প করে ওকে ডাকছে। তক্ষুণি ওটা উল্টে ফেলে সব নোংরা মাটিতে ছড়িয়ে দেখতে চায়। আবার হাত পা ধরে আটকাই ওকে। এবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো, গাড়ির রেডিও চালিয়ে একটা দুটো গান শুনলো।

আমি যখন প্রায় মনে করতে শুরু করেছি যে ওর মাথার পোকাটা হয়ত একটু শান্ত হয়েছে তখনি পোড়ার মুখো রেডিওটা বাজাতে শুরু করলো "With the Beat and the Rhythm of the Night," আর আবারো মাথার পোকাটা নেচে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো পার্কিং লটে ওর নাচ। ওই সময় যারাই আমাদের দেখেছে তারাই হয়তো ভেবেছে যে আমরা হয়তো প্রচুর রঙিন পানীয় টেনে জলপথে বিহার করছি। কিন্তু সাধারণ কোক ছাড়া সত্যি আমরা আর কিছুই খাই নি। এই সব যখন চলছে আর আমার মাথা লজ্জায় বার বার কাটা যাচ্ছে, সেই সময় ড্রাঙ্ক বাসটা এসে দাঁড়ালো। শনি রবিবার বহু ছাত্র ছাত্রী সন্ধেয় বার ভ্রমণে বের হয়। তাদের যাতে মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাতে না হয় তার জন্য স্পেশাল বাসের ব্যবস্থা আছে। ছাত্ররা এই বাস গুলি কে "ড্রাঙ্ক বাস" নামে ডাকে। বাসটা এসে দাঁড়াতেই দৌড়ে গিয়েই তার ড্রাইভেরকে জিজ্ঞেস করলো সেও মাতাল অবস্থায় আছে কি ? ড্রাইভার এই প্রশ্নে বেশ গম্ভীর হয়ে বললো না, সে মত্ত নয়। এরপর কিছুক্ষণ লুকোচুরিও খেললো। শেষে রাত প্রায় সাড়ে তিন'টে নাগাদ বাড়ি গেলো। শরীর আর মনের ধকল থেকে আমার তখন মর মর অবস্থা।

মা-বাবা, পরিবারের সকলেই আমাকে ধীর স্থির বলেই জানেন। হয়ত আমার মধ্যেও একটা ছটফটে সত্ত্বা আছে। নইলে লিসার এই দৌরাত্ম আমার এতো ভালো লাগে কেন? অবশ্য ও কেন আমার সাথে মেশে তা ঠিক বুঝতে পারি না। আমিতো এদেশে খুবই নতুন, ওর সাথে আলাপও খুব বেশী দিনের নয়। আলাপটা হয়েছিল বেশ অদ্ভুত ভাবে। ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের একটা খবরের কাগজ আছে। জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট থেকে সপ্তাহে পাঁচদিন বের হয়। সমস্ত কাজ ছাত্ররাই করে। লিসা ওই কাগজের জন্য লেখে। ওরা ক্যাম্পাসের বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটা লেখা লিখছিলো। সেই সূত্রে আমাকে ইন্টারভিউ করতে এসেছিল ও। ইন্টারভিউ তো হলো তারপর লেখাটাও বের হলো, কিন্তু আমাদের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হলো না, সেটাও কতকটা ওর উৎসাহেই। মাঝে মাঝে আমার ঘরে পৌঁছে যায়, কখনো আমার অফিসে। অনেক মার্কিন ছেলেকে কাটিয়ে দিয়ে ও আমার মতন এইরকম সাদা মাটা চরিত্রের কাছে কেন যে বার বার ফিরে আসে তা আমি অনেক ভেবেও বুঝতে পারি নি। ছটফটে মুখোশের ভেতরের মানুষটাকে টেনে বের করে আনতে পারলে হয়তো একটা উত্তর পাওয়া যেত। কিন্তু সেটা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। কয়েকবার ওর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু প্রত্যেকবারই উত্তরে ওর নতুন কিছু একটা পাগলামি উপহার পেয়েছি। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে আমার প্রশ্ন। আর আমি পড়ে গেছি ঘোরতর ধাঁধায়।

স্কুলে যাবার পথে আজ পেলাম মিতার চিঠি। আশ্চর্য্য, প্রায় দু মাস পর ওর চিঠি পেলাম অথচ দু মাস যে কেটে গেছে সেটাই খেয়াল করি নি। নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে স্কুলে হাজির হলাম। কলকাতায় থাকতে প্রায় প্রতিদিনই দেখা হত আমাদের। যখন দেখা হত না তখন ঘন্টার পর ঘণ্টা কেটেছে টেলিফোনে। মিতাকে বাদ দিয়ে নিজের জীবন কি করে কাটবে, এমন কি একটা দিনও কি ভাবে কাটাবো সেটা ভাবতেই পারতাম না। আমার ইচ্ছে ছিল এদেশে আসার আগে অন্ততঃ আমাদের বিয়েটা রেজিস্ট্রি করে আসার। মিতাই রাজি হয় নি। বেশ মনে আছে ও বলেছিল "একটা কাগজ দিয়ে নিজেদের বেঁধে রাখার কোন মানে হয় কি ? অদৃশ্য সুতোয় আমরা অনেক শক্তভাবে বাঁধা আছি।" সুতোর বাঁধন কতখানি শক্ত জানি না, তবে বিদায়কালে ওর ছল ছল চোখের ভাষা আমার চোখে এখনো ভাসে। এখানে এসে প্রথম প্রথম প্রায় প্রতিদিনই ওকে চিঠি দিতাম। ওর চিঠিও আসত খুব ঘন ঘন। অথচ – একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে মিতার চিঠিটা খুলে বসি। বেশ লম্বা চিঠি। ধব ধবে সাদা কাগজে, মিতার অসাধারণ হাতের লেখায়, ওর প্রিয় কালো কালিতে লেখা।

রঞ্জু,

এই মাত্র রেডিওতে একটা রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান শুরু হলো। প্রথম দুটো গান ছিল, "আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ" আর "সহে না যাতনা, দিবস গনিয়া।" গান দুটো শুনে আমার মনে হল এখুনি তোমাকে একটা চিঠি লিখি। তাই টেনে নিয়েছি কাগজ কলম।

আচ্ছা, মাঝে মাঝে তুমি এতো নিষ্ঠুর হয়ে যাও কেন ? সব পেয়েছির দেশে গিয়ে কি তুমি সব কিছু পেয়েই বসে আছো নাকি ? মানলাম তুমি না হয় অনেক কাজের মানুষ, তোমাকে অনেক কিছু পেতে হবে, অনেক কিছু করতে হবে। কিন্তু যারা একদিন তোমাকে চোখের জলে বিদায় দিয়েছিল, যারা তোমার পথ চেয়ে দিন গুনছে, তাদের কি কিছুই পেতে নেই ? দু ছত্র চিঠিও না ? তোমার মায়ের কাছেও খবর পেয়েছি বাড়িতেও চিঠি দেওয়া অনেক কমিয়ে দিয়েছো তুমি ? গত তিন মাসে একটাও চিঠি পান নি তোমার মা। কিন্তু, কেন এরকমটি হবে ? ঋতু বদলের সাথে সাথে তোমার চিঠি দেওয়াটাও কি বাড়তে পারে ?

তোমার ওখানে তো এখন বসন্ত শুরু হয়েছে। কলকাতায় বসে যে বসন্তের হাওয়া অনুভব করা যায় তা তোমার কাছ থেকেই শিখেছিলাম। এই রকম এক মার্চ মাসের দিনেই ভিক্টোরিয়ার মাঠে বসেই তুমি আমাকে বসন্তের হওয়া

চিনিয়েছিলে। এখনো কলকাতায় কিন্তু বসন্তের হাওয়া বয়। শুধু তাকে চিনে নেওয়া চাই। আমি জানি তোমার ওখানকার বসন্ত সত্যিই বসন্ত (অন্ততঃ গর্ব করে তুমি তাই লিখেছিলে), কলকাতার মতো ইঁট, কাঠ, কংক্রিটে ধাক্কা খাওয়া এক অচেনা হাওয়া কেবল নয়। তবুও কলকাতার বসন্ত একান্ত কলকাতারই। আমিও তাই, হয়তো বা তুমিও।

এখন কি গান বাজছে জানো ? "শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, হে প্রিয়, মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।" তোমাকে চিঠিতে কোনোদিন নামের সঙ্গে কোন অলংকরণ যোগ করি নি, যেমন আমার অনেক বন্ধুই করে থাকে। ও জিনিসটা আমার কোন দিনই ধাতে সয় না। আমার কেবলি মনে হয় ওই সম্বোধন গুলো আমাদেরকে সিনেমার নায়ক নায়িকাদের পর্যায় নিয়ে আসে। আর তাদের জীবনের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে সেগুলো সব সময় না চাইলেও, এক একটা সময় আসে যখন সেগুলো করতে মন-প্রাণ কেঁদে ওঠে। যেমন এই মুহূর্তে, ঠিক এখনি আমার ভীষণ ভাবে ইচ্ছে করছে তোমাকে আমার রঞ্জু বলে ডাকি। তুমি হয়তো আমার এই ছেলেমানুষিতে হো হো করে হেসে উঠবে। তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না। কিন্তু জানো তো, সত্যি বলছি, ভীষণ কাছে পেতে ইচ্ছে করছে তোমায়। নিজের চিঠিতে ওপরের বলা কথা কোট করাটাও আমার ভালো লাগে না। কিন্তু আজকের অনুষ্ঠানের গানগুলো আমার মানসিকতার সাথে এতটাই একাত্ম হয়ে পড়ছে যে আমি বুড়োদাদুর ভাষার কাছে বার বার হেরে যাচ্ছি। অনুষ্ঠানের শেষ গানটাও আমাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেলো,"নয়ন ছেড়ে গেলে চলে।"

আচ্ছা তুমি কি ......

আমার চিঠি পড়ায় বাধা পড়লো হঠাৎ। মাথায় ঠক করে এসে পড়লো একটা লাল আপেল। চমকে মুখ তুলে দেখি সামনেই দাঁড়িয়ে হাসছে লিসা। হাসি থামিয়ে জিগ্গেস করলো "কি নিউটন সাহেব, কি হচ্ছে ?" উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলে গেলো প্রসঙ্গান্তরে। সেন্ট্রাল ক্যাম্পাসে কি নাকি একটা হচ্ছে, আমাকে ওর সঙ্গে যেতে হবে। চিঠিটা ভাঁজ করে উঠে দাঁড়ালাম। লিসার অনুরোধ, আদেশ কিছুই উপেক্ষা করার সাধ্য এখন আমার নেই। দু মিনিটের মধ্যে ও আমার হাত ধরলো, হাঁটতে লাগলো আমার গা ঘেঁষে, বক বক করতে করতে। ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চললাম সেন্ট্রাল ক্যাম্পাসের দিকে। পড়ন্ত বিকেলের রোদ পড়ছে ওর মুখে, বসন্তের ঠান্ডা বাতাসে উড়ছে ওর সোনালী চুল। ওর চোখে মুখে দুষ্টুমির ঝলক। লিসার সৌন্দর্য পান করতে করতে, ওর নরম হাতের স্পর্শ নিতে নিতে অনুভব করলাম আমার অন্য হাতে তখনো শক্ত করে ধরা আছে মিতার চিঠিটা। অর্ধেকটা এখনও পড়া বাকি। কি জানি কি লিখেছে তাতে ?

শাশ্বতী বসু

দৈত্য-দলনী

ঘুম ভাঙ্গল আজ খুব ভোরে। এই সময়ে সচরাচর আমার ঘুম ভাঙ্গে না। বিছানা থেকে উঠেই জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালাম। ঘন ঝিনুক শাঁস রঙা আকাশের টুকরোগুলো দেখা যাচ্ছে সবুজ ন্যাশনাল ফরেস্টের ঘন বুনটের ফাঁকে ফাঁকে। আকাশ নির্মেঘ। বসন্তের শুরু। গাছের পাতায় ঝিরঝিরে সকালের ঠাণ্ডা মৃদু হাওয়া। মন ভাল হয়ে গেলো এক নিমেষে।

ধড়াচুড়ো পরে পথে বেরিয়ে পড়লাম হাঁটতে। ততক্ষণে সূর্যের কুসুম রঙা নরম আলো গাছের মাথা থেকে কিছু কিছু পথে এসে পড়েছে। পথশিশুরা সেই নরম আলোর ওমের তলায় তখনো গুটিসুটি মেরে আরামে শুয়ে। এ পথগুলোতে ঠাণ্ডা হাওয়াও নেই। আমারও লক্ষ এই রোদের উষ্ণতায় ভরা রাস্তা গুলো। এদের মধ্যে একটা বেছে নিয়ে হাঁটছি নিজের মনে। চোখে পড়লো এক অশীতিপর বৃদ্ধা। সামান্য ঝুঁকে টুক টুক করে হাঁটছেন। সঙ্গে চাকা লাগানো একটি বড় ব্যাগ। সেটি ঠেলে ঠেলে হাঁটছেন। শম্বূক গতিতে। বৃদ্ধা লাল টুকটুকে ঢোলা গরম জ্যাকেট, আজানুলম্বিত সোয়েটার ও আরও কয়েকটি জামা কাপড়ের স্তর গায়ে চাপিয়ে সজ্জিত ও প্রশস্ততর হয়েছেন। অধিকন্তু সঙ্গের ব্যাগটি – এই সব নিয়ে তিনি ফুটপাথ জুড়ে আছেন। তাই ফুটপাথ থেকে নেমে তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম। রাস্তায় কেউ নেই।

মিনিট কয়েক পরে ফিরে আসছি। দেখি বৃদ্ধা ঠিক প্রায় একই জায়গায়। এবার আমরা মুখোমুখি। হাসলাম।

– হ্যালো!

– এই দেখো না আমি বেরিয়েছিলাম কলেজে যাব বলে। কিন্তু পারলাম না। পা ব্যথা করছে এমন। চলতে পারছিনা।

হিসেবি মন সতর্ক মুহূর্তে। কিছু কর্তব্য এসে পড়ছে নাকি? হয়ত বৃদ্ধার কোন স্বজনকে ফোন করতে হবে ...... কিম্বা আরও বেশী কিছু, হয়ত ট্রিপল জিরোতে এ্যাম্বুলেন্সে......। কিন্তু না। শুনছি উনি নিশ্চিন্তে বলে চলেছেন একটুও না থেমে .....

– এই কদিন আগে আমি ফুটপাথের ঠিক এই জায়গায় পড়ে গেছিলাম। নাকে খুব লেগেছিল। পায়ের গোড়ালিতে এতো লেগেছিল যে দপ দপ করছে এখনো।

বলছেন কি! শরীরের এই অবস্থা! এর মধ্যে আবার বেরিয়েছেন! কিন্তু উনি কেন ফোন করে কাউকে ডাকছেন না? প্রায় পাঁচ মিনিট তো দেখছি উনি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। হয়ত খুব একটা লাগে নি। তাই মনের উত্তেজনা সামলে বলি

– একটু রেস্ট নাও আজ বাড়িতে গিয়ে। দেখো ঠিক হয়ে যাবে।

এমন ভাবে কথা গুলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো যে মনে হোল এ মহিলাকে আমি বহুদিন ধরে জানি। কেন এমন হল? নিজের মনেই চিন্তাটা একবার চকিতে উঁকি দিয়ে গেলো। এ বোধ হয় সঙ্গগুণ। মহিলা এমন সহজ মনেই হচ্ছে না উনি রাস্তায় একজন অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলছেন।

– রেস্ট নেবো কি? এই তো আমার বাড়ি ৩২ নম্বর, পাশেই। বলে পাশের সুন্দর ফুলে ভরা বাড়িটিতে নির্দেশ করলেন।

ভাবি এইমাত্র বেরিয়েছেন তা হলে? দু পা হাঁটলেই বাড়িতে ঢুকে যাবেন। যাক, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। আমাকে আর কাউকে ফোন করতে হবে না – স্বার্থপর মন ইতিমধ্যেই সে সব ভেবে ফেলেছে। নিশ্চিন্ত হয়ে বলি

– তুমি কলেজে যাচ্ছিলে ? এই এত সকালে ! কি কোর্স করছ ? কোথায় ?

– TAFE (Technical and Further Education) এ। কাছেই ।

– সে কি ! সে তো অনেক দূর !

মনে ভাবি ... এখান থেকে ১০ মিনিট হেঁটে ট্রেন ষ্টেশন। তারপরে ট্রেন। ট্রেন থেকে নেমে পাক্কা ১৫ মিনিটের পথ হেঁটে। উনি ওখানে যান রোজ ?

– সেখানেই যাচ্ছিলাম। বৃদ্ধা আবারও বাজেন। তিন দিন ধরে ঘরে বসে আছি। আর কতদিন থাকব বল ? আজ আবার কবিতা তার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে আসবে। আমার সঙ্গে পরিচয় করাবে। আমায় যেতেই হবে। নইলে ...

– কবিতা কে ?

– আমার ব্যাচমেট। ইন্ডিয়ান। কী যে সুন্দর কী বলব তোমায়। এই এক মাস ক্লাস করছি। ওই শুধু আমায় রোজ ফোন করে ।

– কেন তোমার ফ্যামিলি ? নিজের কানেই নিজের প্রশ্নটি বেখাপ্পা শোনায়।

– ব্যস্ত, ব্যস্ত সব। সময় পেলে করে।

– তা তুমি কী কোর্স করছ ?

– "বেবি কেয়ার" এর কোর্স। কখন লাগে বলা তো যায় না বল ? তা ছাড়া সময়কে তো কিল করতে লাগবে। বৃদ্ধা যেন একটু আনমনা। হাসেন।

এ বলে কী ? এই আশি বছর বয়সে "বেবি কেয়ার" এর কোর্স করছেন যে কোন সময় লাগতে পারে বলে ? বৃদ্ধার বয়সের কথার সঙ্গে চকিতে মনে পড়ে গেলো বেশ কিছুদিন আগে টিভিতে দেখা ১০৫ বছরের এক জাপানি মহিলার জন্মদিন পালনের দিন দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকারের কথা। জন্মদিনে উপহার পাওয়া টাকা দিয়ে উনি কী কিনবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে সেই জাপানি মহিলা বলেছিলেন "বুড়ো বয়েসের জন্য জমিয়ে রাখবো। তখন তো টাকার দরকার হবে"। অর্থাৎ সেই ১০৫ বছরেও তাঁর বুড়ো বয়স আসেনি। সুতরাং ইনি তো সেই তুলনায় ...

ততক্ষণে আমার বাগানের দিকে চোখ পড়েছে।

– তোমার বাগানের ফুল খুব সুন্দর। প্রসঙ্গ ঘোরাই আমি।

– কাছে এসে দেখো অ্যালোভেরা কেমন সুন্দর ফুল ফুটিয়েছে !

সত্যিই অ্যালোভেরা গাছ তাদের লালচে গেরুয়া রঙের মুকুট মুকুট ফুল ফুটিয়ে বাগান আলো করে রেখেছে। মুগ্ধ হয়ে তাকাই। উৎসাহ পেয়ে বৃদ্ধা বলেন –

– পাতাও খুব উপকারী। তুমি পাতার ভেতরের জেলিটা মুখে মেখে দেখবে কেমন সুন্দর স্কিন হবে তোমার। ঠিক এই আমার মত। মনেই হবে না তুমি টিন-এজার নও।

– বল দেখি আমার বয়েস কত ?

বলে তিনি আমার দিকে তাঁর মুখ বাড়িয়ে দেন । চোখে পড়ে বৃদ্ধার তেলতেলে কিন্তু শিথিল হয়ে যাওয়া মুখমণ্ডল, কাজল পরা সযত্ন চর্চিত চোখ আর লিপস্টিক রঞ্জিত লাল টুকটুকে শুষ্ক দুটো ঠোঁট । কিন্তু আপাত শুষ্ক সেই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ছে অনাবিল মধুর হাসি – আত্মতৃপ্তি আর আত্মবিশ্বাসের । ভাল লাগে । কথা হয় আরও দু একটা ।

তারপর হেসে হাত নেড়ে বৃদ্ধাকে ছেড়ে এগিয়ে যাই ।

ইতিমধ্যে সপ্তাহ খানেক কেটে গেছে । আজ মহালয়া । এই দক্ষিণ গোলার্ধের দেশে বাস করেও কী এক সুদূর স্মৃতি মেদুরতায় আজ আমি সেই সেই কুয়াশা মাখা ভোরে উঠে পড়েছি । খুব নিচু আওয়াজে শুনছি "যা দেবী মধু কৈটভ হারী দৈত্য দলনী ..." । যেন ঢাকের আওয়াজ কানে আসছে, যেন পাচ্ছি শিউলির সুবাস । মন উতলা হোল বাইরের খোলা আকাশ আর টাটকা হাওয়ার টানে । রাস্তায় নেমে আসি ।

অনেক ঘুরে এসে আবার আমি সেই নরম রোদের রাস্তায় হাঁটছি । মনে হঠাৎ এক অনাবশ্যক কৌতূহল তৈরি হোল । সেই বৃদ্ধাকে কী দেখতে পাব আজ ? ওই তো অদূরেই ৩২ নম্বর বাড়ি । অচিরেই কৌতূহলের অবসান । সেদিনের মত আজও পথ জুড়ে সেই লাল জ্যাকেট আর ট্রলি ব্যাগ দাঁড়িয়ে । এক মহিলার সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত । পাশ কাটিয়ে এগোলাম ।

– হ্যাঁ, ক্লাস তো ছিল আজ । আমি বিউটিসিয়ানের কোর্স করছি । আজই ছিল প্রথম দিন । কিন্তু দেখ যেতে পারলাম না । পায়ে এমন লাগলো গতকাল .... । চলতে পারছি না ।

আমি বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট । কী শুনছি ? আমি কী ভুল শুনছি ? সেই বৃদ্ধা । বলছেন সেই পথচারিনীকে ।

– কোথায় কোর্স করছো ? পথচারিনী শুধোয় ।

– এই TAFE এ । আজ আবার শারলি আসবে । ওঁর বয় ফ্রেন্ড নিয়ে । আমার সঙ্গে পরিচয় করাবে ।

– এই বয়সে তুমি এতো কিছু করছো ?

– টাইম তো কিল করতে হবে ?

– জানো আমার বয়েস কত ?

– কত ?

– এইট্টি সিক্স । মনেই হয় না তাই না ? চল তোমায় দেখাই আমি কী মুখে মাখি ।

বৃদ্ধা হাসছেন । সেই লাল টুকটুকে শুষ্ক ঠোঁটে একই আত্মতৃপ্তির, আত্মবিশ্বাসের মধুর হাসি ।

যেতে যেতে কানে যায় সেই এক, একই কথা । সেই পুনরাবৃত্তি, সামান্য একটু অদল বদল । তাছাড়া যেন সকালের সেই রেকর্ডেড চণ্ডী পাঠ । পার্থক্য ? নিশ্চয়ই আছে । চণ্ডী এখানে নিজেই যে পাঠ করছেন তার মাহাত্ম্য । ট্রলি হাতে লাল জ্যাকেটের আবরণে অ্যালোভেরা গর্জন তেলে সুসজ্জিত অভিনয় কলায় অসামান্য নিপুণা এ কালের চণ্ডী । পায়ের তলায় ভূলুণ্ঠিত পরাজিত শত্রু, মহা পরাক্রমশালী আধুনিক বিশ্বায়ন যুগের এক সুবিশাল দৈত্য । "নিঃসঙ্গতা" ।

প্রিয়া চক্রবর্তী

হারিয়ে গেছে যারা

মগজ এর চেয়ে বেশি ভারী স্কুলের ব্যাগ নিয়ে অন্যদিনের মতো সেদিনও বাড়ি থেকে রওনা দিলাম । দরজার বাইরে পা দিতেই বুঝলাম সব কিছু কেমন একটু চুপচাপ, স্বাভাবিকের থেকে একটু বেশি থম্‌থমে ।

শুক্লা কাকিমা এখনো জামা কাপড় শুকোতে দালানে বেরোয়নি। রেবা আর রেবার দিদিকেও দেখলাম না রিকশার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে, ওদিকে ছটিকদার ঘরের জানলাও বন্ধ, কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম যখন পর্ণাদির বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে গেলাম – কই, রেওয়াজের আওয়াজ পেলাম না তো ?

পর্ণাদি আমাদের পাড়ার সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রী এবং আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। বাবা সবসময় বলত "কি মারাত্মক ইন্টেলিজেন্স মেয়েটার, চোখগুলো দেখেছিস ? সব সময় কি উজ্জ্বল আর দেখলেই মুখ ভরা হাসি।" এই সব আর – পাঁচটা কথা মাথার মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে স্কুলের দিকে এগিয়ে গেলাম। স্কুল অবশ্য আমার পাড়ার মতন নয়, আজকেও ওই এক গতানুগতিক রুটিন মেনে ক্লাশ করতে হলো।

কিন্তু বাড়ি ফিরতেই আবহাওয়া আবার বদলালো, দরজা খুলতেই দেখি মা কাজ থেকে ফিরে, সোফার ওপর মুখ গোমড়া করে গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে।

আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো "এসে গেছিস ? তোর জন্যই বসে ছিলাম, আয় খাবি আয়" বলতে বলতে রান্না ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

আমিও পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলাম "কিছু হয়েছে ? মুড অফ ?"

আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল "এখন না, খাবার টেবিলে আমার এসব কথা বলতে ভালো লাগে না।"

আমিও আর সেরকম ঘাঁটালাম না।

কিন্তু সেদিনকে মায়ের, মনমরা হয়ে চুপ থাকার কারণ, খুঁজে পেয়েছিলাম আসছে বেশ কয়েক বছর ধরে।

জানতে পারলাম আমার সেই প্রিয় পর্ণাদির বিয়ে ভেঙে গেছে। নাকি ভেঙে দিয়েছে । কেউ-ই ঠিক করে বলতে পারলো না কিন্তু জিজ্ঞেস করতে উত্তর মিললো ভিন্ন । যেদিন খবরটা পেয়েছিলাম, ছুটে গেছিলাম ওদের বাড়ি, কিন্তু দরজায় তালা দেখে নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল। মনে আছে তারপর এক সপ্তাহ স্কুল যাই নি, শুধু উন্মাদের মতো পর্ণা দির খোঁজ করেছিলাম ।

আসছে বেশ ক'য়েক মাস ধরে অনেক কিছু শুনেছিলাম। শুক্লা কাকিমা বলল পর্ণাদির নাকি শ্বশুরবাড়ি থেকে বিয়ে ভেঙে দিয়েছে কিন্তু কই, উল্টোদিকের বাড়ির রেবা তো আবার বলল পার্কস্ট্রিটে দাঁড়িয়ে কোন এক ছেলের সাথে অসভ্যতামি করছিল, সেই দেখে ফেলে তার হবু বর বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। আবার এও শুনেছি, যে পর্ণাদির নাকি কোন এক বয়সে অনেক বড় ভদ্রলোকের সাথে প্রেম হয়ে ছিল, তাই বাবা-মা নাকি তা'কে ত্যাজ্য করেছে।

পাড়ার সাথে শেষ হয়নি, টিউশনেও সেই একই কথা, অবশ্য একটু আলাদা, ওখানকার খবর হলো পর্ণাদি নাকি আসলে প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়েছিল, সেই জন্যই তো কোনদিন আর দেখা যায়নি।

মাথা গুলিয়ে যেত, আমার এত আদরের স্নেহের মানুষটা আসলে একদম অন্য রকম, খারাপ-ভালো না, কিন্তু অন্য।

দিনের পর দিন বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতাম, কতবার ফোন করেছি, কত ইমেইল করেছি, সোশ্যাল মিডিয়া তে খুঁজেছি, কিন্তু পেলাম কই পর্ণাদিকে ? আসতে আসতে আমার গানের ইচ্ছেটা ও চলে গেল, গানের ক্লাস ছেড়ে দিলাম, স্কুল যাওয়ার সময় মনে করে অন্য গলি দিয়ে যেতাম, যাতে বার বার ওই বাড়ির পাশ দিয়ে না যেতে হয়, বার বার সকালের শূন্যতার মধ্যে দিয়ে না হাঁটতে হয়, গেলেই তো আবার সেই রাগ অভিমানে ভরা প্রশ্নগুচ্ছ।

স্কুল পেরিয়ে কলেজ, তারপর চাকরি। মা বলতো কেমন যেন কঠোর হয়ে গেছি।

কঠোর কিনা বুঝিনি, কিন্তু এটুকু বুঝেছিলাম, যে পর্ণাদি নিজের সাথে সাথে আমার শৈশবের উষ্ণতাও বেশ খানিকটা নিয়ে চলে গেছিলো।

বছরের পর বছর অজস্র ভিন্ন কারণ আর যুক্তি শুনতে শুনতে প্রায় বিদ্ধস্ত হয়েই কেমন একটা অদ্ভুত নকল বিতৃষ্ণা তৈরী করলাম পর্ণাদির প্রতি। বুঝতে পারতাম না কেন এত রাগ, এত অভিমান। হয়তো এসব গুজব শুনতাম বলে, বা হয়তো পর্ণাদির ফিরে না তাকানোর জন্য, কিংবা হঠাৎ করে উধাও হয়ে যাওয়ার জন্য বা হয়তো এসব কিছুই না, হয়তো এসব রাগ আমার নিজেরই ওপর, হয়তো আমি যথাযত চেষ্টা করিনি তাকে খোঁজার।

ধীরে ধীরে পর্ণাদি ও কেবল মাত্র একটা ক্ষীণ স্মৃতি হয়ে যেত, যদি না ...

যদি না প্রায় দু'যুগ পর ঠিকানা বদলি করে একটা অন্য শহরে, অচেনা মানুষ এর মাঝে, অচেনা গন্ধে, অজানা দৃশ্যের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার এই দুরন্ত ইচ্ছেটা দাবিয়ে রাখতাম।

সৌভাগ্যবশত রাখিনি, তাই, যখন নতুন চাকরির খোঁজে ঠান্ডা ঘরে বসে বিন্দু বিন্দু ঘাম মুচ্ছি, হঠাৎ চমকে উঠলাম।

"বড়ো হয়ে গেছিস, কিন্তু মুখখানা সেই একই, হ্যাঁ ?" মাথা তুলে আমি ঠিক যতটা অবাক হয়েছিলাম, ভেতরে ভেতরে ঠিক ততটাই ভেঙে পড়তে চেয়েছিলাম। নাহঃ, গলা চিনতে ভুল হয়নি, আজ এত বছর পরেও না।

সামনে দাঁড়িয়ে আমার সেই ভীষণ আদরের হারিয়ে যাওয়া মানুষ। পর্ণাদি।

আরো এক পা এগিয়ে আমার কাঁধে হাত রেখে আবার বললো "কেমন আছিস ?"

আমি বেশ কিছুক্ষণ কিছু বলতে পারিনি, কি বলা উচিত কি করা উচিত, কিছু মাথায় আসছিলোনা। নিঃশ্বাসটাও যেন অস্বাভাবিক রকমের ভারী লাগছিলো।

খুব কষ্টে ঢোক গিলে নিজের চোখটা তুলে বললাম, "পর্ণাদি ? তুমি ..."

শেষ করতে হলো না, "হ্যাঁ আমিই", মুচকি হেসে বললো পর্ণাদি। "যাগ্গে আমি এখানেই আছি, তুই ইন্টারভিউ শেষ করে নে, I'll come see you after।"

চলে যেতে গিয়ে একটু থেমে দাঁড়িয়ে, ঘুরে বললো "অল দা বেস্ট"।

আমি ভাঙা গলায় "থ্যাঙ্ক ইউ" বললাম।

সেদিন চাকরিটা আমি পেয়ে ছিলাম। আমার নিজের মেধার জন্যই পেয়েছিলাম। কিন্তু সেইদিন আমার কাছে তার হাজার গুণে মূল্যবান ছিল সেদিন দুপুরের চায়ের দোকানে বসে ওই এক ঘন্টার কথোপকথন। অনেক কিছু জেনেছিলাম, শিখেছিলাম কিন্তু সব থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল নারীর প্রতি আমাদের পিতৃতন্ত্র সমাজের তিক্ততা।

ইন্টারভিউ রুম থেকে বেরোতেই দেখি, বাইরে পর্ণাদি অপেক্ষা করছে।

কিছু বলার আগেই পর্ণাদি সেই গাল ভরা স্বচ্ছ হাসি হেসে বললো, "দারুন একটা চায়ের দোকান আছে নিচে। একদম সেই শেখর কাকুর মতো। নোনতা নোনতা মিষ্টি মিষ্টি লেবু চা। "আমার উত্তর দেওয়ার আগেই আমার হাত ধরে এগিয়ে গেল। আমিও কেমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে হেটে চললাম।

দুটো লেবু চায়ের অর্ডার দিয়ে আমার পাশে এসে বসল। ছোট বেঞ্চ, আমি একটু সরে বসলাম। পর্ণাদি আমার দিকে ঘুরে আমার হাত দুটো ধরে বলল "খুব অভিমান হয়েছিল, তাই না ?"

এবার আমার চোখের জল আটকানোর চেষ্টা করলাম। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে, মাথা নাড়লাম ।

হাত দুটো আবার নিয়ে আর একটু এগিয়ে বসলো আমার দিকে পর্ণাদি। "বল কি বলবি, যা জিজ্ঞেস করার কর। আমি তোর সব প্রশ্নের উত্তর দেব।"

যে মুহূর্তর জন্য এতগুলো বছর অপেক্ষা করতে করতে আশা ছেড়ে দিয়েছি, আজ যখন সামনে এসে দাঁড়ালো, আমার কান্না ছাড়া আর কিছুই বেরোলো না।

হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ভেঙে পড়লাম ।

যা মনে আছে, তারপর প্রায় মিনিট পনেরো অঝোর ঝরে কেঁদেছিলাম আর পর্ণাদি শুধু চুপ করে সামনে বসেছিল। আমাকে কাঁদতে দিয়েছিলো।

সেই দুপুরে চা খেতে খেতে জেনেছিলাম, বিয়ে'টা আসলে পর্ণাদি নিজেই ভেঙে দিয়েছিলো, রেজিস্ট্রির মাস তিনেক আগে যখন বোম্বে থেকে একটা চাকরির অফার পায়, তখন শশুর বাড়ির লোক মানতে পারেনি যে বাড়ির বৌ'য়ের জন্য তাদের ছেলেকে এদিক থেকে ওদিক শিফট করতে হবে, এটা তাদের কাছে একটা অভাবনীয় ব্যাপার। তাদের দাবি ছিল, পর্ণাদির সেই সামান্য চাকরি ছেড়ে দিয়ে, তাদের ছেলের যেখানে কাজ, সেখানেই সংসার করবে।

চিন্তা ধারণার পেছনে কারণ জিজ্ঞেস করতে পর্ণাদিকে তার হবু শাশুড়ি উত্তর দিয়েছিলো, "ছেলেরা আবার কবে থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে মেয়েদের পেছন পেছন ঘোরে ? সংসার করা তো তোমার আমার মতো মেয়েদেরই কাজ। আর যদি সেরকম ইচ্ছে করে, না হয় ওখানে কোথাও একটা, ছোট খাটো পার্ট টাইম দেখে নিও। তোমার শখও মিটলো, আমার ছেলেকেও আর হাত পুড়িয়ে খেতে হয়না।

"তাই সে দিন পর্ণাদি এবং তার বাবা-মা রুখে দাঁড়িয়েছিলো। সব শোনার পর কাকিমা নাকি বলেছিল "যদি আপনি আপনাদের ছেলেকে আমার মেয়ের সাথে পাঠাতে না চান, তাহলে সেটা জেনে, আমি আমার মেয়েকে আপনাদের ছেলের সাথে কি করে পাঠাই বলুন তো ?" দরজার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলো "ক্ষমা করবেন"।

সেদিন রাতের ট্রেনেই, অফার লেটার নিয়ে বোম্বের জন্য বেরিয়ে যায় পর্ণাদি, আর ফেরে নি।

বাকিটা সময় ওই লেবু চা খেতে খেতেই আমরা নিজেদের ফেলে আশা সত্তাগুলো স্মৃতিচারণ করে কাটিয়ে দিলাম।

তারপর আরও বছর দশেক কেটে গেছে। বয়েস বেড়েছে, এখন বাবা-মা'র সাথে বোম্বেতেই থাকি। কাজে উন্নতি হয়েছে, একটা ফ্ল্যাট কিনেছি, আরও বড়ো কোম্পানিতে আরও ভালো চাকরি করি, আর সেই বিশাল কাঁচের ৩০ তোলা অফিস বিল্ডিং-এর, সি-ই-ও লেখা ঠান্ডা ঘরে বসে, আমার পাড়ার সেই ভীষণ মেধাবী ছাত্রী, আমার সব থেকে প্রিয় মানুষ, আমার পর্ণাদি।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

‘বদনাম’, সৌদামিনী ও আপাতবিরোধী বিশ্বস্ততা

রবীন্দ্রসাহিত্যের নারী – লিখতে শুরু করার আগে থেকেই বেশ বুঝতে পারছিলাম যে কাজটি সহজ হবে না মোটেই। প্রথমত বিষয়টি বহু আলোচিত। প্রাজ্ঞ রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ থেকে আরম্ভ করে আমার মতো সাধারণ রবীন্দ্র পাঠক, এই বিষয়টিতে বিভিন্ন দিক থেকে আলোকপাত করেছেন অনেকেই। বলা হয়ে গেছে অনেক কথা। বহু বিশ্লেষিত এই বিষয়টি নিয়ে তাই কিই বা আর বলার থাকতে পারে ? দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশালতা এবং ব্যাপ্তি এক বা একাধিক উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র নির্বাচনের কাজটি বেশ কঠিন করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, ছোটগল্প, নাটক ও উপন্যাসের বিপুল সম্ভারে অসংখ্য নারীচরিত্রের মিছিল, আর প্রায় প্রত্যেকেই তারা বহুর মধ্যে বিশিষ্ট। মনের মণিকোঠায় তাদের অনেকের উজ্জ্বল উপস্থিতি অনস্বীকার্য। তাই সমস্যা হল কাকে ছেড়ে কাকে নিয়ে লিখব ? ‘পূজারিণী’র শ্রীমতী ? রাজ আদেশ উপেক্ষা করে শ্বেতশুভ্র বুদ্ধমূর্ত্তির সামনে পুজোর থালি সাজিয়ে আরাধ্যের উপাসনায় রত, স্থির, শঙ্কাহীন। যে কোন মুহূর্তে ঘাতকের হাতে মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও আপন বিশ্বাসে অটল। ছবিটি ঝাপসা হয়ে আসে। সে জায়গায় ভেসে ওঠে ‘কালোকোলো’, ‘গোলগাল’, ‘নাকে নথ পরা, কৌতুকপ্রিয়’ এক গ্রাম্য বউ – চিরপরিচিত গ্রামের পথ দিয়ে, রথতলা দিয়ে, পোস্টঅফিস আর ইস্কুলঘরের পাশ দিয়ে পুলিশের সঙ্গে চলেছে জেলখানায়। ‘শাস্তি’ গল্পের চন্দরা – স্বামীর প্রতি দুরন্ত অভিমানে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে বদ্ধপরিকর। সে ছবিও আড়াল হল। এবারে স্পষ্ট হয়ে উঠল ‘ছিপছিপে, পাতলা, আঁটসাঁট’ চেহারার অত্যন্ত সুকুমার মুখশ্রীযুক্তা এক নারী যিনি ‘শাড়ীর সঙ্গে সেমিজ পরে থাকেন এমন এক যুগে যখন প্রবীণা গৃহিনীরা শাড়ীর সঙ্গে সেমিজ পরাটাকে নিতান্তই খৃষ্টানী বলে অগ্রাহ্য করতেন।’ ‘গোরা’ উপন্যাসের আনন্দময়ী – গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের গৃহিনী হওয়া সত্ত্বেও যিনি মৃত আইরিশ দম্পতির সন্তানকে জন্মমুহূর্তে বুকে তুলে নিয়েছিলেন এবং বড় করেছিলেন নিজের সন্তানের পরিচয়ে। এছাড়াও আছে ‘রক্তকরবী’র নন্দিনী, ‘চার অধ্যায়ে’র এলা, ‘চতুরঙ্গে’র দামিনী বা ‘উর্বশী’ কবিতার উর্বশী যারা প্রত্যেকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল; বলা যেতেই পারে যে তারা হল ‘‘a class by themselves’’.

রবীন্দ্র সাহিত্যের নারীচরিত্র যারা মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে তাদের সংখ্যা একাধিক। তবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে নারীচরিত্রের এই বহুলতার কারণে কাজটি একদিক থেকে সহজও বটে। রবীন্দ্রচনাবলী হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছি বিশেষ কোন গল্প বা কবিতার কথা না ভেবেই। এ যেন সেই ক্যালাইডোস্কোপে চোখ রেখে জানালার দিকে তাকান – ক্যালাইডোস্কোপটিকে সামান্য ঘোরালেই এক এক বার এক এক রকম নকশা। মনে আশা ঠিকই মিলবে দেখা এমন একজনের সঙ্গে যাকে নিয়ে আমি আমার মতো করে কিছু লিখতে পারি। অনেক কথা বলা হয়ে যাওয়ার পরেও যার চরিত্র আমার নিজস্ব চিন্তা ভাবনার আলোয় আরও একবার আলোকিত হবে, অনেকটা ক্যালাইডোস্কোপিক ডিজাইনের মতো। ভাবতে ভাবতে খুলে গেল গল্পগুচ্ছের ‘বদনাম’। গল্পটিতে নারী চরিত্র একটিই। সে হল পুলিশ ইনস্পেক্টর বিজয়বাবুর স্ত্রী সৌদামিনী।

গল্পের শুরুতে ‘ক্রিং ক্রিং ক্রিং সাইকেলের আওয়াজ। সদর দরজার কাছে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন ইনস্পেক্টর বিজয়বাবু।’ হন্যে হয়ে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন ‘অনিল ডাকাত’ ওরফে বিপ্লবী অনিল মিত্তিরকে। বাড়ী ফিরতে রাত হয়েছে তাঁর। ভাতের থালা সাজিয়ে আদর্শ গৃহিনীর মতো অপেক্ষমানা স্ত্রী সৌদামিনী। আকারে ইঙ্গিতে স্বামীকে সে জানাতে দ্বিধা করে না যে সেই ডাকাতটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। তবে বিজয়বাবু যেই অনিলের গতিবিধি জানতে চান সৌদামিনী ঘাড় বেঁকিয়ে বলে ওঠে, ‘আমি তোমার স্ত্রী হয়েছি, তাই বলে কি পুলিশের চরের কাজ করব ? তোমার ঘরে এসে যদি ধর্ম খুইয়ে বসি, তবে তুমিই বা আমাকে বিশ্বাস করবে কি করে।’ ইনস্পেক্টর চিনতেন তাঁর স্ত্রীকে খুব ভাল করে। ‘খুব শক্ত মেয়ে, এর জিদ কিছুতেই নরম হবে না।’

গল্পটি আগাগোড়া পড়লে বোঝা যায় সদুর চরিত্র সম্বন্ধে বিজয়বাবুর এই মন্তব্য কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ । তবে তার চরিত্রের যে দিকটি পাঠক হিসেবে আমাকে সব থেকে বেশী আকৃষ্ট করে তা হল নিজের আচরণীয় ধর্ম সম্পর্কে তার ধারণা এবং সেই ধর্ম পালনে তার একনিষ্ঠতা । বিজয়বাবু পুলিশের চর নিতাই চক্রবর্তীর কাছে খবর পেয়েছেন যে সেই রাত্রে মোচকাঠির জঙ্গলে স্বদেশীদের এক মস্ত সভা হবে । অত্যন্ত উত্তেজিত তিনি । পরিকল্পনাটি স্ত্রীর কাছে ঘোষণা করামাত্র সে বলে, 'শোনো – ও মোচকাঠির জঙ্গল ওসব বাজে কথা । সে তোমাদেরই ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরছে । তোমাদের মুখের উপরে তুড়ি মেরে দেবে দৌড়, এ আমি তোমাকে বলে দিলুম ।' স্বামীর আপ্রাণ প্রচেষ্টার প্রতি সদুর এই স্পষ্ট কটাক্ষপূর্ণ উক্তি বিজয়বাবুকে খানিকটা বিচলিত করে । তাঁর আটপৌরে ঘরণী যে সংসার সামলায় বারমাস, রাঁধে বাড়ে, রাত-বিরেতে তিনি বাড়ী ফিরলে খাবার থালা আগলে বসে থাকে, সেই স্ত্রীকে যেন তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না । তাঁর মনে যথার্থ কারণেই সন্দেহ দেখা দেয় যে সদুই গোপনে অনিল মিত্তিরকে পুলিসের হাত এড়িয়ে পালিয়ে যেতে সহায়তা করে চলেছে । যে কুকুরটি রাত দুটোর সময় সদুর হাতের কাটলেট আর পুডিং না পেলে ডাকতেই থাকে সে হয়তো কুকুরের ছদ্মবেশে সেই বিপ্লবীটি । সে আবার হরবোলা কিনা ! সব জন্তুর ডাক নকল করতে পারে । ঠাট্টা করে সে কথা সদুকে জানাতেই কিন্তু সে জ্বলে ওঠে, 'অ্যাঁ, শেষকালে আমাকে সন্দেহ ! এই রইল তোমার ঘরকন্না পড়ে, আমি চললুম আমার ভগ্নীপতির বাড়ীতে ।' সদুর আচরণ তখন নিতান্তই আর পঁচজন বাঙালী গৃহিণীর মতো যে কিনা স্বামীর সামান্য ঠাট্টাটুকুও সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়ী যেতে চায় । সেই মেয়ে বিপ্লবীকে সাহায্য করার মতো মনের বল পাবে কোথায় ? তবে ধন্দ লাগে বিজয়বাবুর, সেইসঙ্গে পাঠকদেরও – কোনটা যে সদুর আসল কথা তা ধরা যায় না ।

যথারীতি সদুর কথামতো মোচকাঠির জঙ্গলে বিজয়বাবুদের অভিযান সে রাতে ব্যার্থ হয় । অনিল ডাকাতের কার্যকলাপ কিন্তু বন্ধ থাকে না । এবারে সে বাবা ভোলানাথের চিহ্নিত সিদ্ধপুরুষ হিসেবে গ্রামবাসীদের মন জয় করে নেয় । হিন্দু পাহারাওয়ালারা পর্যন্ত তার গায়ে হাত ছোঁয়াতে চায় না । বিজয়বাবুর নিজের কথায়, 'এই কিছুদিন বেলে খালাস পেয়েছিল, সেই সুযোগে দেশের হাওয়ায় যেন গাঁজার ধোঁওয়া লাগিয়ে দিলে ।' ইতিমধ্যে আর এক অশান্তি দেখা দেয় । এক বিশেষ কারণে বিজয়বাবুর মামাতো ভাই গিরিশের মেয়ের বিয়েতে পুরুত মেলা ভার হয়ে ওঠে । ভাগ্যক্রমে এক বৃন্দাবনবাসী বাবাজির সন্ধান মিলে যায় । তাঁকে খাইয়ে দাইয়ে খুশী করে সেই বিয়ের পুরোহিতের কাজটি করান যেতে পারে । এই কাজে বিজয়বাবু সদুর সাহায্য চান । পরম উৎসাহে রাজী হয়ে যায় সে । সন্ন্যাসীর প্রতি তার ভক্তি দেখে পাড়ার লোক হেসে অস্থির হয় । সদু নিজেও হেসে বলে, 'দরকার পড়লেই ভক্তি উথলে ওঠে । বাবাঠাকুরেরা পায়ের ধুলো নিলে গলে যান । মিনুর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমার ভক্তিটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে ।' কাজ হাসিল করতে ছলনার আশ্রয় নিতে সে পিছপা নয় । কিন্তু সদুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হল নিজের ছলনা সম্বন্ধে সে অকপট । আর সময়বিশেষে ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতে যে সে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করে এমন কথাও মনে হয় না । তার এই লুকোচুরি না করার চেষ্টাতেই তাকে বুঝে ওঠা যেন কঠিন হয়ে পড়ে । তার কথাবার্তা, আচার আচরণ আর পাঁচজনের থেকে আলাদা না হলেও কোথায় যেন সে তাদের থেকে আলাদা । তার হাসিঠাট্টার মধ্যে যেন কিছু একটা লুকিয়ে থাকে যা তার সাধারণ চালচলন সত্ত্বেও তাকে করে তোলে রহস্যময়ী । মিনুর বিয়ে শেষ হলেই সদুর পরম ভক্তির আধার বাবাজিটি আত্মপরিচয় ঘোষণা করে চম্পট দেন । সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে যান যে তিনিই ফেরারী বিপ্লবী অনিল ডাকাত । সদু স্বামীকে পরামর্শ দেন চোর ডাকাতের পিছনে সময় নষ্ট না করে বাসিবিয়ের আয়োজন করতে ।

বিজয়বাবু অনিল ডাকাতের নিরন্তর চালাকির গল্প সদুকে শোনাতে থাকেন । সদু বলে, 'ওর গল্প যতই শুনি আমারই তো মন টলমল করে ওঠে ।' অনিলের প্রতি তার স্নেহপূর্ণ প্রশ্রয়ের মনোভাব কখনোই স্বামীর কাছে গোপন করে না সে । গল্পের শেষ অংশে বিজয়বাবু একদিন তাকে বলেন, 'এবারে একটা সরকারী কাজে তোমার সাহায্য চাই । নইলে আমার মান থাকে না । পুলিশের লোকেরা নিশ্চয়ই জেনেছে এই কাছাকাছি কোথায় এক জায়গায় একজন মেয়ে আছে । সেই এখানকার খবর কেমন করে পায় আর ওকে সাবধানে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় । সে আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়ে । ওরা বলছে সে এই পাড়ারই কোন বিধবা মেয়ে । যেমন করে হোক তার সন্ধান নিয়ে তার সঙ্গে তোমায় ভাব করতে

হবে।' স্বামীর মুখরক্ষা করতে এ কাজে রাজী হয় সৌদামিনী। পতিব্রতা হিন্দু রমণীর ধর্ম বজায় রাখতে সে এ কাজের ভার নেয়।

স্ত্রীর কথামতো নির্দিষ্ট দিনে রাত্রি একটার সময়ে সিদ্ধেশ্বরী তলার মন্দিরে বিজয়বাবু ও তাঁর লোকজন জড় হন। অনিলের সাহায্যকারিণী কোন যোগিনী ভৈরবী, এই ভয়ে ইনস্পেক্টরবাবুর সঙ্গের লোকেরা ফিরে যান একে একে। একা বিজয়বাবু। রাত তখন একটা। মন্দিরের দরজার কাছ থেকে মেয়েলি গলায় মন্ত্রোচ্চারণ শোনা যাচ্ছে। সাহসে ভর করে তিনি দিলেন দরজায় ধাক্কা। মন্দিরের ভিতরে মিটমিটে প্রদীপের আলোয় দেখলেন শিবলিঙ্গের সামনে জোড়হাতে বসে আছেন তাঁর স্ত্রী। আর অনিল ডাকাত একপাশে পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে। 'সদু, অবশেষে তোমার এই কাজ!' - স্বামীর বিস্ময় মেশা উক্তির জবাবে সদু বলে, 'হ্যাঁ, আমিই সেই মেয়ে যাকে তোমরা এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছ। নিজের পরিচয় দেব বলেই আজ এসেছি এখানে।'

তার প্রতারণা প্রকাশ পেলে সংসারে নিজের আসনটি টলমল হবে, দেশ ছেয়ে যাবে কলঙ্কে-এ সব জেনেও সদু স্বামীর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারে নি। একদিকে স্ত্রী হিসেবে স্বামীর ও সংসারের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ অন্যদিকে দেশপ্রেম ও মুক্তিসংগ্রামীদের প্রতি তার শ্রদ্ধা, - এই দুই পরস্পরবিরোধী বিশ্বস্ততার মধ্যে শেষপর্যন্ত সদু দেশমাতৃকার প্রতি তার কর্তব্যবোধকেই বড় করে দেখে। তার মতে, 'আমাদের দেশে দৈবাৎ দুই-একজন পুরুষ দেখা যায়। — আমরা দেশের মেয়েরা যদি এইসব সুসন্তানদের আপন প্রাণ দিয়ে রক্ষা না করি তবে আমাদের নারীধর্মকে ধিক।' অনিল ডাকাতকে ধরতে পারলে তার ইনস্পেক্টর স্বামীর কাজে পদোন্নতি হত এ কথা জানা সত্ত্বেও দিনের পর দিন সে হাসি ঠাট্টায় তাঁকে বিভ্রান্ত করে সাহায্য করে গেছে পালিয়ে বেড়ান এক বিপ্লবীকে। এই ছলনার জন্য সে বিন্দুমাত্রও লজ্জিত নয়। সবশেষে সে তার স্বামীকে বলে, 'প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি ভালোবেসে, প্রাণপণে তোমাকে বঞ্চনা করেছি কর্তব্যবোধে, এই তোমাকে জানিয়ে গেলুম।' আর এই বিশ্বাসেই সে বাইরের জগতের সঙ্গে প্রতারণা করলেও নিজের কাছে নিজে ছিল বিশ্বস্ত। অন্তর থেকে সে যা করা উচিৎ মনে করেছে আগাগোড়া তাই সে করেছে। সে প্রকৃত অর্থেই ছিল নারীবাদী।

প্রশ্ন উঠতে পারে সদু কি সত্যিই স্বামীকে প্রাণপণ ভালবাসত? তাহলে সে এই প্রতারণা চালিয়ে গেল কি করে? সদু যে পরস্পর সংঘাতী এই দুই মূল্যবোধের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এমন কথা গল্পে স্পষ্ট করে কোথাও বলা নেই। প্রয়োজনের সময়ে ছলনার আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারে তার মত সুস্পষ্ট — 'পুরুষরা বোকা, তারা আমাদের বলে সরলা, অখলা, — এই নামের আড়ালেই আমরা সাধ্বীপনা করে থাকি আর ঐ খোকার বাবারা মুগ্ধ হয়ে যায়। আমরা অবলা অখলা কুকুরের গলার শিকলের মতো এই খ্যাতি আমরা গলায় পরে থাকি, আর তোমরা আমাদের পিছন পিছন টেনে নিয়ে বেড়াও। তার চেয়ে সত্যি কথা বল না কেন — সুযোগ পেলে তোমরাও ঠকাতে জান, সুযোগ পেলে আমরাও ঠকাতে জানি। আমরা এত বোকা নই যে শুধু ঠকবই আর ঠকাব না।' তাই বিজয়বাবু অক্লান্তভাবে অনিলের সন্ধান করে চললেও দেশের প্রতি কর্তব্যবোধে সে গোপনে সাহায্য করে গেছে অনিলকে। আবার স্বামীর প্রতি ভালবাসারও তার অভাব ছিল না। সে নিজেই তার স্বামীর কাছে স্বীকার করেছে 'মিথ্যা স্তব করব না — পুলিশের কাজে তোমার খবরদারির শেষ নেই, কিন্তু আমাকে তুমি চোখ বুজে বিশ্বাস করে এসেছ, যদিও সবসময় সেই বিশ্বাসের যোগ্যতা আমার ছিল না। আমি এইজন্যই তোমাকে ভক্তি করি, আমার ভক্তি শাস্ত্রমতে গড়া নয়।' আর এইখানেই সৌদামিনীর চরিত্রের বিশেষত্ব। তার ভাল মন্দ, ঠিক বেঠিক, উচিৎ অনুচিতের সংজ্ঞা সে নিজেই তৈরী করে নিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে গিয়েছিল। সমাজ অনুমোদিত বা শাস্ত্রে নির্দেশিত কর্তব্যবোধের বাইরে বেরিয়ে এসে সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও সৌকর্যের (grace) সঙ্গে আপন অন্তরের কতর্ব্যবোধ দ্বারা চালিত হয়েছে সে। নিজের সঙ্গে কখনও ছলনা করে নি।

'বদনাম' গল্পে বদনামের ভাগী হল সৌদামিনী। শেষপর্যন্ত তার পরিণতি কি হল সে কথা গল্পকার পরিষ্কার ভাবে পাঠকদের জানান নি। অনিলের সাহায্যকারিণীর প্রকৃত পরিচয় যখন উদ্‌ঘাটিত হল সদু তখন তার স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্টবাদিতায় বিজয়বাবুকে বলে, 'দুদিন পরেই সমাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কিরকম নিন্দায় ভরে উঠবে তা আমি

জানি। এই লাঞ্ছনা আমি মাথায় করে নেব। কখনো মনে কোরো না চাতুরী করে তোমার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে এই মানুষকে আলাদা নালিশে জড়াতে পারবে। আমি চিরদিন তাঁর পিছন পিছন থেকে শাস্তির শেষ পালা পর্যন্ত যাব।' শুধু ইনস্পেক্টর গৃহিণীর দৈনন্দিন নিরাপত্তার জীবনে নয়, মানুষ সদুর জীবনের সার্থকতা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপদসঙ্কুল পথ চলাতে। 'দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে আর যাঁরা মানুষের মতো মানুষ তাঁদের হাতে হাতকড়ি পড়ছে, আমরা রেঁধেবেড়ে বাসন মেজে করছি সতীসাধ্বীগিরি ! আমরা অলক্ষ্মী হয়ে যদি কাজের মতন কিছু একটা করতে পারি তা হলে আমাদের রক্ষা।' স্বামীকে ভালবেসেও নিজের এই বিশ্বাসের প্রতি সে বিশ্বস্ত ছিল। এইখানেই সদুর চরিত্রটির অভিনবত্ব। সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধের বিচারে সে কলঙ্কিনী। কিন্তু সদু সমাজের বিচারের পরোয়া করে নি। কারণ সে দুঃখের আগুনে জ্বালিয়ে দিতে চায় 'দেশের যত জমান আস্তাকুঁড়।' দুঃখ পেতে সে প্রস্তুত। 'লোকে বলবে না সতী, বলবে না সাধ্বী। বলবে দজ্জাল মেয়ে।' সেই হবে তার একান্ত গর্বের পরিচয়। 'দজ্জাল মেয়ে' হওয়ার গৌরব বোধই তার চরিত্রটিকে পাঠকের মনে একটি বিশেষ স্থান অধিকারে সাহায্য করেছে বলে আমার মনে হয়।

রবীন্দ্রসাহিত্যের অতুল সম্ভারে নারী হৃদয়ের আশা, আবেগ, আনন্দ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বেদনার উপলব্ধি নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে। বিভিন্ন রূপে ধরা দিয়েছে নারী। সে কখনো শ্যামা, কখনো চিত্রাঙ্গদা, কখনো সাধারণ মেয়ে আবার কখনো কৃষ্ণকলি। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং বিভিন্ন পরিপ্রক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের নারীর এমনই বহুবিচিত্র প্রকাশ যে আজকের নারীও তার কোন না কোনটির সঙ্গে নিবিড় একাত্মতা বোধ করে। আমার আলোচ্য গল্পের সৌদামিনীও এমন একটি চরিত্র যে তার সময়ে তার থেকে অনেক বেশী এগিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে সক্ষম। আপাত অর্থে বিপ্লবী অনিলকে সাহায্য করে স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সদু। কিন্তু সে কথা বললে তার চরিত্রের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। হিন্দু নারীর পতিভক্তি তার অন্তরে জাগ্রত ছিল। মানুষ হিসেবে সে তার স্বামীকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করত। কিন্তু দারোগা হিসেবে যখন তার স্বামী দেশের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল তখন তার কাজে সদু সহায়তা করতে পারে নি আপন কর্তব্যবোধে। স্বামীর প্রতি ভালবাসা, খাওয়া পরার নিরাপত্তার চিন্তা, সমাজ সংসারে কলঙ্কের ভয় তার স্বকীয় ভাবনা চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে নি। ঐ যুগেও সে স্বাধীন চিন্তা করতে এবং সেই চিন্তা অনুযায়ী কাজ করতে পেরেছিল। বিজয়বাবুর জীবিকার জন্য সদুর পক্ষে স্বামীর প্রতি ভক্তি, ভালবাসা, কর্তব্য ও দেশমাতৃকার প্রতি ভালবাসা দুই পরস্পর সংঘাতী বিশ্বস্ততা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সৌদামিনী এই দ্বিধাবিভক্ত মূল্যবোধের জন্য অপরাধবোধে ভোগে নি। আর এইখানেই চরিত্রটির আধুনিকতা, তার নিজের সময়ের সীমা ছাড়িয়ে আজকের নারীর কাছেও সে এক দৃষ্টান্তস্বরূপ।

> The most important thing one woman can do for another is expand her sense of actual possibilities.
>
> – Adrienne Rich

সুজয় দত্ত

অর্ডি-নারী

জুলাই মাসের ভ্যাপসা গরম। বৃষ্টির দেখা নেই অনেকদিন। বিরাট লেকচার হল-টার গোটা ছয়েক আদ্যিকালের সিলিং ফ্যানের সাধ্যি নেই সে-গরমের মোকাবিলা করে। তবু তারা একটানা যান্ত্রিক শব্দে চেষ্টা করেই চলেছে। একঘর তরুণতরুণী বসে বসে ঘামছে আর ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে মুক্তির আশায়। কেউ কেউ বিরক্ত মুখে খাতায় আঁকিবুকি কাটছে, কারো কারো চোখ আধবোজা কিন্তু নেহাত সামনে বসেছে বলে ঘুমোতে পারছেনা, আর পিছনের দিকে যারা বসেছে তাদের তো পোয়াবারো – ঘুম-আড্ডা-খুনসুটির অবাধ লাইসেন্স। এরই মধ্যে কয়েকজনের দৃষ্টি সজাগ, প্রখর মনঃসংযোগ। না, ক্লাসঘরের সামনের দিকের দেওয়ালে বিশাল ব্ল্যাকবোর্ডে সাদা চক দিয়ে যে ইনভার্টিব্রেট অ্যানাটমির সচিত্র বিবরণী লেখা চলছে অনেকক্ষণ ধরে, সেদিকে নয়। অন্য অ্যানাটমিতে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সালোয়ার কামিজের চল তখনো হয়নি, সাবেকী শাড়ীই একচেটিয়া। ক্লাসঘরের লম্বা লম্বা কাঠের বেঞ্চিগুলোয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকা সেই শাড়ীগুলোতে আটকে যাচ্ছে উৎসুক কিছু চোখ, আর কল্পনা শাড়ী ভেদ করে পাড়ি দিচ্ছে আরো গভীরে।

স্নাতকোত্তরের এই ক্লাসটা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার মিলিয়ে। আমার মতো ফার্স্ট ইয়ার মাস্টার্সের ছাত্রই বেশী, কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারের যাদের চিনি, তাদের মধ্যে শৌভনিককে দেখতে পাচ্ছি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দু-সারি সামনে বসে থাকা ঐন্দ্রিলার দিকে। এদের রোম্যান্সটা এই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সর্বজনবিদিত। দুজনেই অবস্থাপন্ন পরিবারের একমাত্র সন্তান, দুজনেই দারুণ শৌখীন। তাই মিলেছে ভাল। আমার বাঁদিকে পাঁচ সীট দূরে মস্তানমার্কা চকরাবকরা শার্ট আর একমুখ দাড়িওয়ালা প্রসেনজিৎ মাঝেমাঝেই আড়চোখে চোরা দৃষ্টি হানছে ওর থেকে অনেকটা কোণাকুণি দূরত্বে বসে থাকা স্মার্ট চেহারার প্রিয়দর্শিনীর দিকে। ক্যাম্পাসের এক প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতা-নেত্রী ওরা, সবাই একডাকে চেনে। আর আমার ঠিক পিছনের সারিতে মাঝখানের সীটটায় উদ্দীপ্ত ওর জনি ডেপ-স্টাইলের রোমিও-রোমিও মুখ নিয়ে ডানপাশে বসা একমাথা কোঁকড়া চুলের লাবণ্যময়ী মৌমিতার সঙ্গে ক্রমাগত নীচুস্বরে কথা বলে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই মনে মনে জানে যে এ-মাছ বঁড়শিতে গাঁথা সোজা নয় – অনেকে ছিপ ফেলে বসে আছে এর জন্য।

আমি বসেছি ডানদিকে একদম দেয়ালের ধারে, একটু পিছনে। এমনিতে রোজ সামনের দিকেই বসি, চোখে উঁচু পাওয়ারের চশমা নিয়ে যাতে বোর্ড দেখতে অসুবিধে না হয়। কিন্তু আজ লাইব্রেরীতে বইগুলো ফেরত দিয়ে ক্লাসে আসতে একটু দেরী হওয়ায় জায়গা পাইনি, ঠাঁই হয়েছে একধারে। এখানে বসলে ব্ল্যাকবোর্ডের একটা অংশ থামে ঢাকা পড়ে যায়। গলা উঁচু করে মাথা এদিক ওদিক হেলিয়ে নোট নেওয়ার চেষ্টা করছি, এমন সময় হাতের পেনটা হাত ফস্কে মেঝেতে পড়ল। অডিটোরিয়াম-স্টাইল ঢালু মেঝে, ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে সামনের দিকে। পেন গড়গড়িয়ে সিঁড়ি টপকে টপকে সেদিকে যাচ্ছে আর আমি দেয়ালের গা ঘেঁষে তার পিছু ধাওয়া করছি। যেতে যেতে বেশ কয়েকটা বেঞ্চের সারি পেরিয়ে হঠাৎ একটা কিসে যেন আটকে গেল ওটা। দেখি কারো একটা বইখাতা ভরা ঝোলাব্যাগ সীটের পাশে মেঝেতে রাখা। আমি হুড়মুড়িয়ে ওটার ওপর গিয়ে পড়ায় ছিটকে গেল বেশ কয়েক হাত। তাড়াতাড়ি ওটা কুড়িয়ে যার ব্যাগ তাকে দিতে গিয়ে মুখোমুখি দেখলাম মেয়েটাকে। সেই প্রথমবার।

নাঃ, নজরে পড়ার বা নজর কাড়ার মতো কিছুই নেই ওর। না আছে চোখজ্বালানো রূপ, না দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো বেশভূষা বা আভরণ। একটা আলগা শ্রী অবশ্য আছে প্রসাধনহীন মুখটায়। চোখাচোখি হতেই তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। তারপর ছোটখাটো চেহারাটা আরোই কুঁকড়ে গিয়ে আবার লেখায় মন দিল। আর তখনই ওর সামনের খোলা খাতাটা এক ঝলক দেখতে পেয়ে মুগ্ধ হলাম আমি। হাতের লেখাটা মুক্তোর মতো বললেও কম বলা হয়।

আচ্ছা, জুলজির ক্লাস করছি যখন, আমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র। কিন্তু একজন অচেনা সহপাঠিনীকে প্রথমবার সামনাসামনি দেখে তার যা বিবরণ দিলাম, তাতে বিজ্ঞানীসুলভ কাঠখোট্টা মূল্যায়ণের বদলে একজন শিল্পী বা সাহিত্যিকের সৌন্দর্যপিয়াসী মনের পরিচয়ই বেশী ছিল না ? থাকবেই তো। ভেতরে ভেতরে আমি যে দুটোই। শিল্পী এবং সাহিত্যিক। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াটা তো স্রেফ বাড়ীর চাপে। অথবা হয়তো বলা ভাল আমি শিল্প-অভিলাষী এবং সাহিত্যপ্রয়াসী। সোজা কথায়, আমি লিখি আর ছবি আঁকি কিন্তু আমার সৃষ্টিরা সব অসূর্যম্পশ্যা। তারা কেউ আমার টেবিলের ঘুপচি ড্রয়ারগুলোর বাইরে বেরিয়ে পৃথিবীর আলো দেখেনি। কোথাও কোনো প্রদর্শনী হয়নি আমার ছবির, কোনোদিন কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়নি আমার গল্প। কিন্তু তাতে কী ? আমাদের বাড়ীর বাগানের রঙ্গন গাছটা কি রোজ ফুল ফোটায় কোনো প্রদর্শনীতে দেওয়ার জন্য ? আমাদের পাঁচিলের ধারের সবুজ গাছগাছালিতে নিত্যদিন যে পাখীরা গাইতে আসে, তাদের গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে ক্যাসেট বেরোয় না বলে গান গাওয়া বৃথা ? আসলে ওদের জন্মই তো সৌন্দর্য্য সৃষ্টির জন্য। আমি মনে করি – মানে মাঝে মাঝে মনে করতে ভাললাগে আরকি – যে আমারও তাই। স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীলতার মধ্যে যে একটা নান্দনিক তৃপ্তিবোধ মিশে থাকে, তার রসে একবার মজলে মন আর কোনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির পরোয়া করে না – এই সার কথাটা আমি বুঝে গেছি। আমার কাছে সেই পরম তৃপ্তিবোধই হল অমৃত। বাকী সব অমৃতি। এ-জীবনে নামীদামী মিষ্টির দোকানের পাঁচ টাকা পিস্ দশ টাকা পিস্ অমৃতি চাখতে না পাই তো বয়েই গেল। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি বলে "খুব তো বড় বড় কথা। বাবার হোটেলে খেয়ে বাবার পয়সায় কলেজে পড়তে পড়তে শখের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে ওসব অনেক কিছুই কপচানো যায়। যদি এঁকে-লিখে পেট চালাতে হত তখন?", সেই কথাটা অবিশ্যি অস্বীকার করা কঠিন। জঠরানল তো কত অসীম প্রতিভাধর স্রষ্টাকেও এই পৃথিবীর ধুলোকাদামাখা বাজারে ফুটপাথের ফেরিওয়ালা বানিয়েছে। সেখানে আমি ব্যতিক্রম হতাম কিসের জোরে ?

এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি পরে পেয়েছিলাম কমলপ্রিয়ার কাছে। মানে ওর সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে যাওয়ার পর শিখেছিলাম ওর কাছে। কমলপ্রিয়াটা আবার কে ? কেন, সেদিনের সেই জুলজি ক্লাসের কোণের দিকে দেয়ালের ধারে বসে থাকা সাদামাটা লাজুক মেয়েটা ? আসলে হয়েছিল কী, সেদিনের সেই আচমকা চোখাচোখির পর একটু কৌতূহল জেগেছিল ওর সম্বন্ধে আমার মনে। নানারকম প্রশ্ন। ও সবসময় এতো চুপচাপ কেন ? ক্লাসের সময়টুকু ছাড়া আর বাড়তি এক মুহূর্ত ক্যাম্পাসে থাকে না কেন ? সহপাঠী বা পাঠিনীদের সঙ্গে মেলামেশা আর হৈ-হুল্লোড়ের ব্যাপারে এতো কুণ্ঠিত কেন ? ক্লাসের অন্য ছেলেমেয়েদের উপেক্ষা ওকে বিচলিত করে না কেন ? এই বয়সের একটা মেয়ে এত নিরাভরণ কেন ? ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যি বলতে কী, তারপর থেকে জুলজি ক্লাসে সেই শৌভনিক-প্রসেনজিৎ-উদ্দীপ্তর মতো আমারও চোখ বারবার ব্ল্যাকবোর্ড থেকে সরে যায় আর মন অন্যদিকে চলে যায়। দুটোই গিয়ে আটকায় ক্লাসঘরের সেই কোণে যেখানে একজন উদাসীনতার প্রতিমূর্তি হয়ে অপূর্ব সুন্দর হাতের লেখায় নিঃশব্দে নোট নিয়ে যাচ্ছে। তাকে ঘিরে রহস্য যতই জমাট বাঁধে বুকের মধ্যে, তার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছেটাও ততই তীব্র হতে থাকে। কিন্তু উপলক্ষ্য ? উপলক্ষ্য চাই তো একটা। নিদেনপক্ষে কোনো অজুহাত। তখন তো আর আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতো লিঙ্গের তোয়াক্কা না করে অপরিচিতের দিকে "নাইস মিটিং ইউ" বলে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার চল ছিলনা।

যাইহোক, একদিন একটা অজুহাত হঠাৎ নিজে থেকেই এসে হাজির। অফিসটাইমের একটা প্রচন্ড ভীড় বাসের পাদানিতে ঝুলে ঝুলে কলেজ যাচ্ছিলাম, আচমকা ঠেলাঠেলিতে হাত ফস্কে আছড়ে পড়লাম এবড়োখেবড়ো রাস্তার ওপর। ডানপায়ে দারুণ চোট, সারা গা কেটে-ছড়ে একাকার। ব্যস, এক সপ্তাহ কলেজ কামাই। আট দিনের দিন পায়ে ব্যান্ডেজ জড়ানো অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের বেশ খানিকটা আগে জুলজি ক্লাসে ঢুকতে গিয়ে দেখি মেয়েটা প্রায় ফাঁকা লেকচার হলের এককোণে বসে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। এমন সুবর্ণ সুযোগ কেউ ছাড়ে ? আমি ওর খানিকটা পিছনে একটা সীটে ব্যাগ রেখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওর কাছে গিয়ে বললাম, "ইয়ে, মানে, একটা কথা ছিল...."। ও একবার আমার দিকে, তারপর মাটির দিকে তাকিয়ে মৃদু ঠোঁট নাড়াল, "বলুন"। যেহেতু আগে কখনো কথা হয়নি আমাদের, তুমি-আপনির ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু দ্বিধায় ছিলাম। ওর উত্তর শোনার পর আর দ্বিধার অবকাশ নেই, বললাম

"আমার একটা অ্যাকসিডেন্টের জন্য সাতদিন আসতে পারিনি, এদিকে প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষাও এসে গেল, আপনার নোটখাতাটা একটু যদি পেতাম, জেরক্স করে নিতাম।" অল্পক্ষণ নীরবতার পর নীচুস্বরে জবাব এল, "ঠিক আছে। এই ক্লাসের পরে দিই ?" আমার তো মন নাচছে, কিন্তু মুখে হ্যাংলাপনা দেখানো চলবে না, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ" বলে সীটে ফিরে গেলাম। তারপর দেড়ঘন্টা ধরে ক্লাসে ঠিক কী হল বলতে পারব না, কারণ কান সেসব শুনলেও মনের গ্রামোফোনে সারাক্ষণ অন্য রেকর্ড বাজছিল। একটু আগের সেই কথোপকথনের নিরন্তর রিপ্লে। তারপর ক্লাস শেষ হতে না হতেই নির্লজ্জ পাওনাদারের মতো তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে ডানহাতে বঙ্গলিপি খাতাটা বাড়িয়ে দিল। ঈষৎ শ্যামলারঙের সে-হাতে একটা চুড়িও নেই। আর খাতার ওপর মুক্তাক্ষরে নাম লেখা "কমলপ্রিয়া বায়েন"। নামটা তো দারুণ সুন্দর, কিন্তু পদবী বায়েন ? এই পদবীর কারো সঙ্গে তো কোনোদিন পরিচয় হয়নি এর আগে। আমি কিছু বলার আগেই শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "কাল ফেরত পেলেও চলবে"।

– "ওঃ, আচ্ছা, কী বলে যে আপনাকে –"

– "ফিজিওলজি আর বায়োকেমিস্ট্রির নোটও লাগবে কি ?"

এটা তো আশা করিনি! তার মানে ওই ক্লাসদুটোতেও যে আমি আর ও একই সেকশনে, সেটা ও খেয়াল করেছে ? আমার তো বহুদিন আগেই নজরে পড়েছে। তবে ওইসব ক্লাসে যেহেতু আমার বাড়ীর কাছের দু-একজন বন্ধুবান্ধবও পড়ে, নোটগুলো তাদের কাছ থেকেই নেব ভাবছিলাম। কিন্তু এ যে মেঘ না চাইতেই জল! আমতা আমতা করে বললাম, "হ্যাঁ, মানে, যদি কাল ক্লাসের পর ওগুলো –"

– "আজই ব্যাগে আছে খাতাদুটো। এই যে।"

আবার প্রসারিত হয় সেই চুড়িহীন হাত। আমি কথা হারিয়ে ফেলি। হায়রে ! তখন যদি মেয়েটা জানত, নিজের অজান্তে আমাকে কী দিয়ে ফেলল সেদিন – । আর আমিও যদি সেই কাঁচাবয়সে বুঝতাম মাঝ-ফেব্রুয়ারীর ওই বিশেষ দিনটার পশ্চিমী তাৎপর্য – । হ্যাঁ, তারিখটা ছিল চোদ্দই ফেব্রুয়ারী।

****

কোথা দিয়ে যে কেটে গেল একটা গোটা বছর, কে জানে। আজ আবার চোদ্দই ফেব্রুয়ারী। আজ রিমঝিমকে নিয়ে অনেককিছু করার ইচ্ছে ছিল। পার্কস্ট্রিটের রেস্তোরাঁয় খাওয়া, মেট্রোয় সিনেমা দেখা, লিন্ডসে স্ট্রিটে একটু কেনাকাটা। কিন্তু ওকে ওসবে রাজী করায় কার সাধ্য ? ওর ভেতরের এই ঠান্ডা জেদটা, যার কাছে বারবার হার মানতে হয় আমাকে, প্রথম আলাপে মোটেই বুঝতে পারিনি। আর আজ এটার জন্যই ওকে আরও বেশী ভালবাসি। সত্যি, ও এই এক বছরে আমাকে অনেকটা বদলে দিয়েছে। আর আমি ? আমি শুধু বদলাতে পেরেছি ওর ডাকনামটা। আসলে কমলপ্রিয়া নামটার প্রতি অনুরাগ আমার আরো বেড়ে গেছে, যেদিন থেকে খেয়াল করেছি আমার নিজের নামের মানেটা। আমি নীলোৎপল। তবে ওর ডাকনামটা আমার পছন্দ ছিলনা গোড়া থেকেই। কুড়কুড়ি আবার একটা নাম নাকি ? তাই ওটা বাতিল করে ওকে এখন ডাকি রিমঝিম বলে। সে তো হল, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমি ওর বিচ্ছিরি ডাকনামটা জানলাম কী করে ? কলেজে তো আর কেউ ও-নামে ডাকে না। সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বলি। একবছর আগের সেই নোট আদানপ্রদানের দিন আমাকে অতিরিক্ত সাহায্য করতে গিয়ে যে বাড়তি নোটখাতা দুটো আমাকে দিয়েছিল কমলপ্রিয়া, তার পিছনের পাতায় ছিল একটা দারুণ চমক। সে-প্রসঙ্গ উঠলে আজও লজ্জা পেয়ে যায় ও। বাড়ী গিয়ে সেই জৈব রসায়নের খাতা উল্টে দেখি তার একেবারে শেষে মলাটের ভিতরের দিকটায় চোখজুড়ানো বাংলা হাতের লেখায় একটা কবিতা !!

বুকের ভেতর অথৈ সাগর, চোখে জলের নদী –
ডুব দিয়ে দেখ, মনের কথা বুঝতে পারিস যদি।
ঠোঁটে আমার অষ্টপ্রহর হাসির ঝিলিক দেখে
ভাবিস বুঝি কান্না এত এল কোথা থেকে ?
সবাই আমার শান্তশীতল রূপটা নিয়েই থাকে,
ভেতরে ঝড় উথালপাথাল – কে তার খবর রাখে ?
তুই তো আছিস মনের দোসর, মন আছে তাই বেঁচে।
তোর তো শুনি জহুরী চোখ, দেখনা সাগর ছেঁচে –
পান্না চুনী মুক্তো মণি যা পাবি সব তোরই।
কিছুই না পাস্, ভালোবাসাই উঠবে দুহাত ভরি।
সব রতনের সেরা রতন – সে ধন দেবো কাকে ?
তোর মতো আর কেইবা জানে আমার এ-মনটাকে ?
তাই তো বলি, ডুবুরি তুই দাঁড়িয়ে কেন চরে ?
আমার বুকের জোয়ারভাঁটায় দেখ না ডুবে মরে।

আর ফিজিওলজির খাতার শেষ-মলাটেও লালকালিতে লেখা –

তুমি ফুটে ওঠো দিব্যপলাশ হয়ে
আমি বসে থাকি প্রতীক্ষাতরুতলে
দখিন হাওয়ায় সমুদ্র কানাকানি
তবু কই সেই বন্ধ দুয়ার খোলে ?

কতবার যে পড়েছিলাম কবিতাদুটো সেদিন, গোনা যাবে না। বার বার মনে হচ্ছিল, এটা কি সত্যিই ওই নিশ্চুপ, নির্বিকার, নিরলংকার মেয়েটার মনের কথা, না অন্য কারো ? ঠিক রবিঠাকুরের "শেষের কবিতা" না হলেও এই শেষ-মলাটের কবিতাই বা কম কী ? যাইহোক, এটা স্বীকার করতেই হবে যে আমিও একটু অদ্ভুত টাইপের। নাহলে প্রায়-অপরিচিতা এক সহপাঠিনীর ভুল করে দিয়ে ফেলা কবিতার জবাবে কেউ তার নোটখাতাতেই আবার কবিতা লেখে ? কিন্তু কী করব ? আমার বুক ঠেলে উঠে আসছে যে লাইনগুলো, হাত নিশপিশ করছে লেখার জন্য, সেগুলো জোর করে চেপে রাখলে সে-রাতে ঘুমই আসবে না। লালের তলায় সবুজ কালিতে লিখলাম,

না খুলুক, তবু সুদূরের হাতছানি
তোমার অরুণরক্তিম অনুভবে।
সময় কঠিন পরীক্ষা নেয় জানি –
দেখা হবে ঠিকই বসন্ত-উৎসবে।

তারপর ? তারপর আর কী ? সেই নোটখাতা পরদিন সকালে জেরক্স করিয়ে ভাবলাম কলেজে গিয়ে ক্লাসে ঢোকার আগে আমার কবিতাটা কালো কালি দিয়ে কাটাকুটি করে দেব। বলব সরি, হাত থেকে একটু কালি পড়ে গেছে ওখানে। কিন্তু এমনই ভাগ্য, সেদিন কলেজের সামনে মিনিবাস থেকে নেবেই দেখি উল্টোদিক থেকে ও হেঁটে হেঁটে আসছে। সর্বনাশ ! এখন তো আর বলতে পারব না খাতাগুলো তিন ঘন্টা পরে ক্লাসে ফেরত পাবেন। নিজেকে ঠাস ঠাস করে চড় মারতে ইচ্ছে হল। কোনোরকমে খাতাদুটো ওর হাতে গুঁজে দিয়ে একপ্রকার ছুটেই পালিয়ে এলাম। এর পরবর্তী

দিনসাতেক, মানে প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার আগে অবধি ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে চললাম, ক্লাসে ওর থেকে যতদূর সম্ভব দূরে বসলাম। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার দিন তো একই ল্যাবে দফায় দফায় আমরা সবাই। সেদিন আর পারা গেলনা, একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলাম। ওর সেই শান্ত চোখের ভাষাহীন চাহনি দেখে আমার হাত কেঁপে গেল, বুনসেন বার্নারের গরম ছ্যাঁকা লাগল, কাঁচের টেস্টটিউব মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। সে এক যাচ্ছেতাই কান্ড। শেষে পরীক্ষা দিয়ে কলেজের গেটের সামনে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখি পিছন থেকে ও এসে দাঁড়াল রাস্তা পার হবে বলে। আমার দিকে চোখ পড়তে একটু সরে এসে নীচুগলায় জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি নিয়মিত লেখেন ?" আমি উত্তর দেব কী, গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনোরকমে মুখ দিয়ে বেরোল, "না, মানে হ্যাঁ, মানে না ঠিক –"। শুনে ওর মুখে কি একচিলতে বিরল হাসি ফুটে উঠল ? বলতে পারব না, আমার তাকাবার সাহস হয়নি। এই সময় আমার বাসটা এসে যাওয়ায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

সেই ঘটনার সময়েই প্রথম লক্ষ্য করেছিলাম যে ও দুবেলা হেঁটে যাতায়াত করে। ওর তো কোনোদিন কোনো বন্ধু-টন্ধু দেখিনা যে তাকে জিজ্ঞেস করে কৌতূহল মেটাব ও কোথায় থাকে, ওর বাড়ীতে কে কে আছে, ইত্যাদি। সুরঞ্জনা বলে একটি মেয়ের সঙ্গে মাঝেমাঝে লাইব্রেরীতে যায় ও, কিন্তু সে তো কলাবিভাগের। তার সঙ্গে আমার মোলাকাতের সম্ভাবনা নেই। অতএব একদিন দুম করে যেটা করে ফেললাম, সেটাকে হিন্দীতে দিওয়ানাপন বললে হয়তো রোম্যান্টিক শোনাতো, কিন্তু তার বদলে বাড়াবাড়ি বা ঝুঁকিপূর্ণ বোকামি বললেও আমি আপত্তি করব না। একদিন ছুটির পর আমার এক স্থানীয় বন্ধুর সাইকেলটা ধার করলাম ওষুধের দোকানে ওষুধ কিনতে যাচ্ছি বলে। আর কমলপ্রিয়া বেরিয়ে বাড়ীর পথ ধরতেই আমি একটু তফাতে তফাতে থেকে ওর পিছু নিলাম। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই, ক্রমশঃ গলির গলি তস্য গলির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে ও, ভয় হচ্ছে এবার বুঝি ওকে হারিয়েই ফেলব। শেষে একটা এঁদোগলির মুখে নড়বড়ে কাঠের দরজা ঠেলে যার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ওর শরীরটা, সেটাকে – সেটাকে কি ঠিক বাড়ী বলা যায় ? আমি নিশ্চিত যে, রোজ বালিগঞ্জ থেকে চকচকে কনটেসায় চড়ে কলেজে আসা অনিন্দ্য রায় বা পার্কস্ট্রীটের বিউটি পার্লারে নিয়মিত ফেসিয়াল করানো সংঘমিত্রা বাসু ওটার জন্য অন্য একটা শব্দ ব্যবহার করত। কিন্তু আমি সেটা পারব না এই জন্যে যে, খোলা জানলা আর আধখোলা দরজার মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি একচিলতে ঘরের সেই গোছানো সংসার, টুকরো-টুকরো কানে আসছে সদ্য-ফেরা মেয়েটাকে ঘিরে তিনটে বিভিন্ন বয়সের বাচ্চার আহ্লাদ-আবদার আর একজন রুগ্ন চেহারার অর্ধশায়িত প্রৌঢ়ার ক্লান্ত কণ্ঠস্বর, অনুভব করতে পারছি সেই ভাঙাচোরা পলেস্তারা-খসা কাঠামোটার ভেতরকার হৃদস্পন্দন। উল্টোদিকের রাস্তাটার কিনারে খোলা নর্দমার ধারে যে পানবিড়ির ছোট্ট দোকান আর তার পাশেই টালির চালওয়ালা চায়ের দোকান, সেই দুয়ের মাঝে সাইকেল গুঁজে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছি আর মনে মনে প্রাণপণে হিসেবে মেলাবার চেষ্টা করছি। নাঃ, মিলছে না, কিছুতেই মিলছে না। সেই শেষ-মলাটের কবিতার হীরে আর হাতের লেখার মুক্তোকে কিছুতেই রাখতে পারছি না সেই বিবর্ণ জরাজীর্ণ ছবিটার মধ্যে। একসময় দেখলাম একটা ফ্যাকাসে সবুজ রঙের ম্যাক্সি পরে কোলে ছোট্ট বাচ্চাটাকে নিয়ে ও বাইরে আসছে বালতি হাতে। সামনেই যে অবিরাম সুতোর মতো জল পড়ে যাওয়া কর্পোরেশনের কল, সেখান থেকে বালতি ভরতে। তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম দোকানের পিছন দিয়ে, কিন্তু মন রয়ে গেল সেখানেই। প্রিয়ার সঙ্গে, প্রিয়ার ঘরে।

অবশ্য বেশীদিন মনকে একা একা থাকতে হল না সেখানে। শরীরও গিয়ে হাজির হল অচিরেই। ঘটনাটা, কিংবা দুর্ঘটনা বলাই হয়তো ঠিক, হঠাৎই ঘটে গেল আগস্টের এক ঝমঝমে বৃষ্টির দিনে। যথারীতি একহাঁটু জল জমেছে কলেজের সামনের রাস্তাটায়। যানবাহন চলাচল মোটামুটি স্তব্ধ। শুধু গুটিকয় সাইকেলরিক্সা মেনগেটের কাছটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দাঁও মারার অপেক্ষায়। ক্লাস-টাস শেষ হওয়ার পরেও ছাতা নেই বলে সেই বৃষ্টির মধ্যে বেরোতে পারছি না, বিল্ডিংয়ের ভেতরেই সেঁধিয়ে আছি। তারপর একটু কমতে মাথায় ব্যাগ চাপা দিয়ে দৌড়ে গেটের কাছে এসেই একটা রিক্সা পেয়ে গেলাম। সবে ফুট দশেক গেছে রিক্সাটা, এমন সময় সামনের ঝোলানো পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখি প্রিয়া ওই বৃষ্টি মাথায় জল ভেঙে রাস্তা পার হচ্ছে। সেই কাদাগোলা জলের নীচে কী আছে না আছে বোঝার তো

কোনো উপায় নেই। যেই রাস্তাটা পেরিয়ে উল্টোদিকের ফুটপাথে উঠতে যাবে, সম্ভবতঃ ফুটপাথের উঁচু ধারটাতে লেগেই সজোরে আছাড় খেয়ে পড়ল জলের মধ্যে। ব্যাগ-ট্যাগ সব নিয়ে। তারপর দুহাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আবার টাল সামলাতে না পেরে ঝপাস। আমি সঙ্গে সঙ্গে রিক্সাঅলাকে গাড়ী ঘোরাতে বলে লাফিয়ে নামলাম, গিয়ে টেনে তুললাম ওকে। শাড়ী-পোশাক সব ভিজে লেপ্টে আছে গায়ে, আমাকে দেখে লজ্জায় কুঁকড়ে গেল একেবারে। বললাম, "দাও ব্যাগটা আমাকে দাও, রিক্সায় ওঠো"।

"ন্না ন্না, আমি ঠিক –"

"কিচ্ছু ঠিক নয়, যা বলছি শোনো, ওঠো রিক্সায়" বলে ওকে একপ্রকার ঠেলেই তুলে দিলাম। তারপর নিজে লাফিয়ে উঠে পাশে বসে রিক্সাঅলাকে পথনির্দেশ দিতে যাব, আচমকা মাথায় এল আরেঃ, মেয়েটা তো জানেনা আমি ওর বাড়ী চিনি। নিজেকে সংবরণ করে ওকেই বললাম ওর বাড়ী কীভাবে যেতে হয় বলতে। সারাটা রাস্তা যথাসম্ভব গুটিসুটি মেরে আমার ছোঁয়া বাঁচিয়ে বসে থাকার চেষ্টা করল ও, কিন্তু ঐটুকু রিক্সায় সেটা সম্ভব নয়। বাড়ীর কাছাকাছি আসার পর ও দেখি পিচের রাস্তার মুখটাতেই নামার জন্য পা বাড়াচ্ছে। আমি বলে উঠলাম, "এখানে কেন ? আরো যাওয়া যায় তো। সেই চায়ের দোকানের আগে অবধি ইজিলি –" বলেই বুঝলাম ভুল করে ফেলেছি। মেয়েটা দেখি বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি মুখ ঘুরিয়ে রইলাম। ওকে চায়ের দোকানের পাশে নামিয়ে দিয়ে আর কোনো কথা না বলে ফেরত আসছি, হঠাৎ মনে হল আচ্ছা, ও কি খেয়াল করেছে আজ প্রথম "তুমি" বললাম ওকে ?

সেদিনটা ছিল শুক্রবার। পরের দুদিন কলেজ নেই। সোমবার আমি মলিকিউলার বায়োলজি ক্লাস থেকে বেরিয়ে ক্যান্টিনের দিকে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি, দেখি পাশের লাইব্রেরী বিল্ডিং থেকে ও-ও সেদিকেই আসছে। আমাকে দেখতে পেয়ে চকিতে চারপাশে একবার সতর্ক দৃষ্টি হেনে সামনে দাঁড়াল, তারপর ব্যাগ খুলে একটা কাগজের মোড়ক বাড়িয়ে ধরল আমার দিকে। বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, "কী এটা ?"

– "সেদিন কত নিয়েছিল রিক্সা জানিনা তো, তাই আন্দাজে –"

– "আচ্ছা, কোনো মানে হয় ? আমাকে কি সত্যিই ওরকম মহাজন-টাইপ দেখতে যে –"

– "কিন্তু আমারও তো ভাললাগা খারাপলাগা আছে, কৃতজ্ঞতাবোধ আছে।"

– "দেখো, তুমি যাই বল, ও আমি নিতে পারবনা। কখনো সম্ভব ? ঢোকাও ওটা ব্যাগে" গলায় কিঞ্চিৎ দৃঢ়তা আনলাম এবার। ও মাথা নীচু করে ব্যাগ থেকে এবার একটা খবরের কাগজের ঠোঙা বার করে বলল, "এটা কিন্তু আমি দিচ্ছি না। মা পাঠিয়েছে।"

– "মা ? মানে তোমার মা ? তিনি তো আমাকে চেনেনই না !" বিস্মিত হই আমি।

– "তাতে কী ? আমি তো চিনি। আমি বলেছি। এটা না নিলে কিন্তু –"

হাত বাড়িয়ে ঠোঙাটা নিয়ে দেখি কয়েকটা নরম পাকের নারকেল নাড়ু। মনটা একটা অদ্ভুত ভালোলাগায় ভরে গেল, ওর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বললাম, "সরি, বিনাশর্তে নিতে পারছি না। একটা শর্ত আছে।"

– "কী ?"

– "যিনি এটা দিচ্ছেন আমাকে, আমি নিজে গিয়ে তাঁকে বলে আসতে চাই কেমন লেগেছে। রাজী ?"

শুনে বেশ একটু অপ্রস্তুত দেখায় ওকে, সামলে নিয়ে বলে, "কেমন লাগল সেটা তো একটা চিঠি লিখেও জানানো যায়। আমি পৌঁছে দেব।"

– "তার মানে ? আমি বড়মুখ করে বললাম তোমার বাড়ী যাব আর তুমি – । তাহলে থাক এটা" বলে কপট অভিমান দেখিয়ে ঠোঙাটা প্রত্যর্পণ করি ওর হাতে। ঠিক এই সময় আমাদের ক্লাসের একদল ছেলেমেয়ে হৈহৈ করতে করতে ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে আমাদের দুজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এল। বায়োফিজিক্সের সায়ন্তন বলে ছেলেটা ফিচেল হাসি হেসে বলে উঠল, "সরি, তোদের প্রাইভেট কনভার্সেশন মাটি করে দিলাম। আমরা সামনের মাসের ইন্টারকলেজ কালচারাল ফেস্টের টিম সিলেকশন নিয়ে মিটিং করতে যাচ্ছি। তুই তো কমিটিতে আছিস ?"। আমি আর কী করি, সত্যিই কমিটিতে নাম লিখিয়েছি, এড়ানো গেল না। প্রিয়া মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল ওখানেই।

সেদিন মলিকিউলার বায়োলজি আর ফাইটোকেমিস্ট্রির পরপর দুটো ল্যাব বিকেলে। সেরে বাড়ীমুখো হতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। ইউনিভার্সিটি চত্বর প্রায় ফাঁকা। বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে মেনগেটের দিকের রাস্তাটা সবে ধরেছি, দেখি সামনেই সিমেন্ট-বাঁধানো গাছতলাটায় কে একটা বসে আছে। আমাকে দেখে এগিয়ে এল। আরেঃ, এ যে প্রিয়া ! অবাক হয়ে বললাম, "কী ব্যাপার ? এইসময় এখানে ? তোমার লাস্ট ক্লাস তো ছিল চারটেয় ?"

– "আমি কিন্তু তখন ঠিক ও-কথা বলতে চাইনি –"

– "কোন কথা ?"

– "সবই তো জানেন – কোথায় থাকি, কীভাবে থাকি। নতুন করে লুকোবার তো কিছু নেই আপনার কাছে, তাই –"

– "ওঃ, সেই বাড়ী যাবার ব্যাপারটা ? আরে আমি মজা করছিলাম একটু। সবকিছু এতো সিরিয়াসলি নিলে চলে ?"

এবার আমার দিকে এগিয়ে আসে সেই পরিচিত আভরণহীন হাত। বাড়িয়ে ধরে খবরের কাগজের ঠোঙাটা। সত্যি বলতে কি. সারাদিনের ব্যস্ততায় আমি ভুলেই গেছিলাম নারকেল নাড়ুর প্রসঙ্গ। বললাম, "তার মানে তুমি স্রেফ এটা দেবার জন্যই এতক্ষণ বসে ছিলে এখানে ?"

কেঁপে ওঠে ঠোঁটদুটো, ভেজা গলায় প্রশ্ন আসে, "বলুন কবে আসছেন আমাদের বাড়ী ?" একটু দূরের ল্যাম্পপোস্টটার আবছা আলোয় দেখি কমলদীঘিতে দুফোঁটা জল টলটল করছে –- উপচে পড়ল বলে। জীবনে এক-একটা মুহূর্ত আসে যখন ভালমন্দ উচিত-অনুচিতের সব হিসেবনিকেশ এক লহমায় ভেসে যায় কোনো এক পরম পাওয়ার হাতছানিতে। কী যে হয়ে গেল আমার, ওর বাড়ানো হাত ধরে কাছে টেনে নিলাম ওকে। আলতো করে চোখের জল মুছিয়ে বললাম "যাব, যে-মুহূর্তে এই 'আপনি' বলাটা ছাড়তে পারবে, তক্ষুণি যাব।" এই প্রথম এভাবে কোনো স্বল্পপরিচিতার তপ্ত শ্বাসপ্রশ্বাসে চঞ্চল হয়ে উঠল শরীর। ও-ও দেখলাম কেঁপে কেঁপে উঠছে। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম পরস্পরের আলিঙ্গনে সেই নির্জন রাস্তায়, জানে শুধু সেই প্রাচীন বটগাছ আর ল্যাবরেটরি বিল্ডিঙয়ের গেট জড়িয়ে ওঠা মাধবীলতার ফুলগুলো।

সেদিনই প্রথম ও নিয়ে গেছিল ওর বাড়ীতে, আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ওর মায়ের সঙ্গে। ওঁর মুখেই শুনি প্রিয়ার সেই অ-কাব্যিক ডাকনামটা। তার আগে পথে যেতে যেতে শুনেছিলাম সেই ভয়ঙ্কর কথাটা – অ্যাডভান্সড স্টেজ প্যাংক্রিয়াটিক ক্যান্সার ভদ্রমহিলার। ছড়িয়েছে শরীরের অন্যত্রও। ধরা পড়েছে অনেক পরে। আর এরপর সেই দেড়-কামরার ঘরে পৌঁছে আরও যা যা দেখলাম-জানলাম, মন একেবারেই তৈরী ছিলনা তার জন্য। আমার সেই লুকিয়ে লুকিয়ে সাইকেলে পিছু নেওয়ার দিন যে তিনটে বাচ্চা ছেলেমেয়ে দেখেছিলাম, তারা আসলে ওর ভাইবোন নয়। ও নিজে প্রাণপণে এই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলেও কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল সপ্তাহে ছদিন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে অতটা সময় কাটানোর পর প্রতি শনি-রবিবার ও যায় কাছেই গাঙ্গুলিবাগানের পুরোনো পল্লীর বস্তিতে। সেখানে একটা অনাথাশ্রমে শিশুদের পড়ানো আর দেখাশোনার স্বেচ্ছাসেবী কাজ করার সূত্রেই ওই তিনটে বাচ্চাকে প্রথম দেখে ও। অচিরেই ভীষণ ভালবেসে ফেলে ওদের, আর ওরাও ক্রমশঃ ওকে ছাড়া থাকতে পারেনা। তারপর হঠাৎ একদিন অনাথাশ্রমটা বন্ধ হয়ে যেতে ওদের এখানে চলে আসা। মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা প্রথম দর্শনেই আমার

মধ্যে কী পেলেন জানিনা – প্রাণ খুলে গল্প করতে লাগলেন। বললেন আগে ওঁরা এখানে থাকতেন না। প্রায় এক দশক আগে ওঁর প্লাস্টিকের কারখানায় কাজ করা স্বামী হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ায় আর দ্বিতীয় কোনো আশ্রয় পাননি। স্বামীর সঞ্চয় বলে কিছু ছিলনা, সামান্য কিছু পেনশন পান। মেয়ে আগাগোড়াই তার কলেজে পড়ার খরচ নিজে চালিয়েছে টুইশন পড়িয়ে আর একটা সরকারী স্বনির্ভরতা প্রকল্পে মহিলাদের হাতের কাজ শিখিয়ে। মানে সেলাইফোঁড়াই, তুলোর পুতুল আর পুঁতির গয়না তৈরী করা। সে নিজে ওসব শিখল কোথে'কে ? কেন, মায়ের কাছ থেকে ? এককালে শরীরে যখন ক্ষমতা ছিল, স্বামীর অস্বচ্ছল সংসার তো তিনি ঐসব করেই টানতেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয় প্রিয়ার চমক। ঘরের এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে কিছু দারুণ দারুণ ক্রোশের কাজ আর এম্ব্রয়ডারী। চুন-খসা দেওয়ালেও পেরেক দিয়ে টাঙানো কয়েকটা। আর পাথুরে মেঝের এককোণে অপূর্ব আল্পনা আঁকা। কেন ? এখানে কি পুজো-টুজো হয় নাকি? না না, ওগুলো স্রেফ মেয়ের শখ। নিজে নিজেই শিখেছে, খুব ভাল হাত। মনে মনে ভাবলাম, হ্যাঁ, সে তো হবেই। ক্লাসের সব নোটখাতা জুড়েই তো রয়েছে শৈল্পিক হাতের নমুনা। ক্রোশে আর এম্ব্রয়ডারী অবশ্য শিখেছিল স্কুলের সেলাই দিদিমণির কাছে। আপাদমস্তক শখ-আহ্লাদহীন মেয়েটার ঐটুকুই একটু নেশা। ওকে জিজ্ঞেস করি, "এগুলো কখনো কোনো বুটিকের দোকানে বা সরকারী হস্তশিল্পের আউটলেটে বিক্রীর চেষ্টা করনি ?"। উত্তর আসে, "সেরকম কোনো জানাশোনা তো নেই। তাছাড়া জীবনে সব জিনিস কি বিক্রীর জন্য ?"

– "তা ঠিক। যেমন তোমার কবিতা। কী, তাই তো ?"

শুনে লজ্জায় মুখ নামিয়ে নেয় ও।

****

সেই ক্রোশে, এম্ব্রয়ডারী আর রঙ্গোলির গুঁড়োগুঁড়ো রং দিয়ে আঁকা চোখজুড়ানো সব আল্পনা এখন আমার শহরতলীর ছোট্ট ফ্ল্যাটটা আলো করে রেখেছে। যেমন রেখেছে ওগুলোর স্রষ্টা। বছর তিনেক হল আমরা দুজন ভাড়া নিয়েছি এটা, সংসার পেতেছি এখানে। দুজনেই অনেক কিছু হারিয়ে তবে পেয়েছি এই ভালবাসার নীড়। সাড়ে চার বছর আগের সেই প্রথম আলাপের ন'মাস পরেই মারণরোগের বিরুদ্ধে লড়াই শেষ হয়ে গেছিল প্রিয়ার মা-র। আমার মা তাঁকে আর করে নিতে পারিনি। আর আমার নিজের মা তো থেকেও নেই। বাবাও। বছর চারেক আগে যখন প্রথম বাড়ীতে বলি প্রিয়ার কথা, আর ওকে নিয়ে আমার পরিকল্পনার কথা, আকস্মিকতার আর তীব্র আশাভঙ্গের সেই শক সহ্য করতে পারেনি ওরা কেউ। বাবা-মা-দাদা – কেউ না। আজও মনে পড়ে – সে-রাতের তীব্র বাকবিতণ্ডার পর নিজের বিছানায় সারারাত জেগে বসে ভাবছিলাম, এর পরের সিনটা কি সেই পরিচিত বাংলা সিনেমাগুলোর মতো হবে, না নতুন কিছু ? আমার মনে অবশ্য প্রিয়াকে নিয়ে সেই মুহূর্তে কোনো দোলাচল ছিলনা – ওকে আমার জীবনের অংশ তো করেই ফেলেছি। প্রশ্নটা ছিল অংকের আর সময়ের। দুজনেই সদ্য মাস্টার্স শেষ করে বেরিয়েছি তখন। ওর মায়ের চূড়ান্ত যন্ত্রণাময় অন্তিম দিনগুলো ওকে এমন গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেছিল যে একসময় তো বলছিল ফাইনাল পরীক্ষাতাই বসবে না। অনেক বুঝিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে রাজী করিয়েছিলাম। তবে রেজাল্ট ততটা ভাল হয়নি। আর আমি ভাল ফল করলেও আত্মনির্ভরতার প্রথম পদক্ষেপ তখনও নেওয়া বাকী। অর্থাৎ চাকরি। তাই আমার এতো বছরের পরিচিত পরিবেশ আর জীবনটাকে ছেড়ে আসতে একটু প্রস্তুতির দরকার ছিল। ওকে যখন জানালাম বাড়ীর প্রতিক্রিয়া আর তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কী করতে চলেছি, ও অনেকক্ষণ চুপচাপ মাথা নীচু করে রইল। তারপর মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল "এতো চড়া দাম দিয়ে কী কিনছ বলতো নীল ? এভাবে নষ্ট করবে জীবনটা ?" আমি ওর চোখে চোখ রেখে হেসে জবাব দিলাম, "নষ্ট করতাম না, কিন্তু একদিন আমাকে একজন প্রশ্ন করেছিল – জীবনে সবকিছু কি বিক্রীর জন্য ?" শুনে বাঁধভাঙা কান্নায় ভিজিয়ে দিয়েছিল আমাকে মেয়েটা সেদিন।

তারপর ? তারপর আর কী ? কয়েকটা বায়োটেক স্টার্টআপ কোম্পানীতে ব্যর্থ আবেদনের পর অবশেষে একটা মোটামুটি নামী প্রাইভেট কলেজ থেকে লেকচারারশিপের ইন্টারভিউয়ে ডাকল যেদিন, সেদিন সত্যিই ভাবিনি চাকরিটা

পেয়ে যাব। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে বাসা খোঁজা শুরু, আর মাস তিনেকের মধ্যেই এই ছোট্ট দুকামরার ফ্ল্যাট। আমার চাকরির খবর পেয়ে খুশী হতে পারেনি বাড়ীর কেউ, কারণ ওরা জানত এটা কিসের সংকেত। শুধু বৌদি চুপি চুপি একদিন "কংগ্র্যাচুলেশন্স, বাবলু" বলে হাতে জোর করে দুশো টাকা গুঁজে দিয়েছিল। ফ্ল্যাটটাও আমি আমার বাড়ীর সবাইকেই দেখাতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু উৎসাহ দেখিয়েছিল শুধু বৌদি। চোখ টিপে বলেছিল, "শুধু ফাঁকা ফ্ল্যাট দেখলে চলবে বুঝি ? যে থাকবে, তাকে দেখব না ?"। উত্তরে শুধু ছবি দেখিয়েছি, কারণ প্রিয়াকে এ-বাড়ীতে আনার প্রশ্নই নেই। ফ্ল্যাটের কাগজপত্র সই করে প্রিয়ার সেই গলির গলি তস্য গলির একচিলতে মাথাগোঁজার ঠাঁইকে টা টা বাই বাই বলে ওকে নতুন জায়গায় এনে তোলার পর একদিন দেখি আমাদের চমকে দিয়ে বৌদি নিজেই হাজির একগাদা উপহার আর মিষ্টি-টিষ্টি নিয়ে। বলল আজ ওর স্কুলে স্পোর্টসের ছুটি, তাই পড়ানো নেই, কিন্তু বাড়ীতে সেকথা না বলে সরাসরি এখানেই চলে এসেছে। প্রিয়াকে দেখে, ওর অতীতের গল্প শুনে, ওর কাজকর্ম সম্বন্ধে জেনে চোখ ছলছল করছে দেখলাম বৌদির। যাওয়ার সময় সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমায় বলল, "এ-বাড়ীতে বিয়ে হয়ে আসা অবধি তোকে কোনোদিন এতো ম্যাচিওর ভাবিনি রে বাবলু। ভাগ্যিস এলাম আজ। বুকটা ভরে গেল তোদের দুটিকে দেখে।"

এই শেষ কথাটার মানে আমি ভালই জানি। আমার স্ত্রী শ্বশুরবাড়ীর প্রায় কারোরই স্বীকৃতি পাবেনা জেনেও বিয়ের অনুষ্ঠানে সব্বাইকে আসতে পীড়াপীড়ি করা। নাঃ, শেষ অবধি সেই অস্বস্তিকর কৃত্রিমতা থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। মানে নিজেরাই নিজেদের রেহাই দিয়েছিলাম আরকি। আমাদের বিয়েতে কোনোরকম অনুষ্ঠান করিনি। রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে রেজিস্ট্রি করিয়েছিলাম শুধু। আমার তরফ থেকে হাজির ছিল শুধু বৌদি। মা আসবে শুনেছিলাম, কিন্তু এলনা শেষ অবধি। শুধুই উপহার পাঠাল। আর প্রিয়ার তরফ থেকে তো কেউই না। ও বলল ওর আসার মতো কেউ নেই। তারিখটা কী ছিল ? বলে দিতে হবে ? অবশ্যই ১৪ই ফেব্রুয়ারী। সে-রাতে আমাদের ফ্ল্যাটের শোবার ঘরের সেই ফুলহীন বাসরে বন্ধ দরজার আড়ালে শুধু জেগেছিলাম আমি আর আমার রিমঝিম। দুজনের দুই শরীর যখন পরস্পরকে নিবিড়ভাবে চিনছে, মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে, সেই পরম-আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তে ও আমার চুলে বিলি কাটতে কাটতে একজন সাধারণ মেয়ের মতোই আবিষ্ট গলায় বলে উঠেছিল, "বল, নীল, বল না – আজ তুমি আমার কাছে কী চাও – বলতে হবে তোমাকে – চুপ করে থেকনা প্লীজ –"। আমার মুখ থেকে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে এল – "একটা মেয়ে চাই, ছোট্ট ফুটফুটে একটা মেয়ে, যে ঠিক তোমার মতো হবে – ভেতরে ইনকমপারেবল, বাইরে অর্ডিনারী।"

বিধাতা বোধহয় শুনেছিলেন সেই ইচ্ছেটা। বছরখানেক পরে আমাদের জীবনে এল প্রিয়ংবদা। হামাগুড়ি থেকে হাঁটতে শিখেই সে দুরন্তপনায় এমন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যে আমি ওর মাকে বলি ওকে হিমশিম বলে ডাকব। অবশ্য ওর দাদা-দিদিরা তাদের স্কুলের পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে ওকে সামলাবার কাজটা অনেকটাই করে দেয়। দাদাদিদি কারা ? কেন, সেই যে সাইকেলে করে রিমঝিমের পিছু নেওয়ার দিন ওর পুরোনো আস্তানায় যাদের প্রথম দেখেছিলাম। ওদের মা (হ্যাঁ, রিমঝিমকে ওরা বরাবর ওই বলেই ডাকত) এখন অন্য একটা অনাথাশ্রমে মাঝেমাঝে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যায় আর সরকারী স্বনির্ভরতা প্রকল্পের মহিলারা বাড়ীতেই ওর কাছে শিখতে আসেন হাতের কাজ। তবে ওর আজকাল সময়ের বড্ড অভাব। হবেই তো – চার ছেলেমেয়ে সামলানো কি চাট্টিখানি কথা ? আমি আমার কলেজের হাজারো ব্যস্ততার মধ্যে যতটা পারি সাহায্য করি, কিন্তু ওদের মা ছাড়া চলেনা। হ্যাঁ, মা বকাবকি করলে তখন অবশ্য আমার কাছে। প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখি, আমি কিন্তু আমার লেখালেখি আর ছবি আঁকা ছাড়িনি। না, আমার কোনো বই আজও বাজারে বিক্রী হয়না, ছবিও যা আঁকি বাড়ীতেই সাজানো থাকে। তাতে আমার কিচ্ছুটি আসে-যায় না।

জীবনে সব জিনিস কি বিক্রীর জন্য ?

****

ঊর্মি চক্রবর্তী

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে কিছু লিখতে হবে এই মানসিকতা নিয়ে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বসেছি – অনেক ব্যস্ততার মধ্যে অনেক সময় বের করে।

মনের ইচ্ছে এক সংগ্রামী নারীকে নিয়ে লেখা যিনি প্রায় সারাটা জীবন, জীবনসংগ্রামের জোয়ার ভাঁটায় নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন – ঠোঁটে ছিল এক স্নিগ্ধ হাসির রেখা, ছিলনা কোন না পাওয়ার বেদনা, অসম্ভব জিদ এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি নিয়ে এই নারীর জীবনকথা আমাকে সতত প্রেরণা দেয়। আজ সেই অদ্ভুত নারী শক্তির স্মৃতি রোমন্থন করবো।

ইনি আর কেউ নন, আমারই ঠাকুমা শ্রীমতি অসীমা মুখার্জি। আমার বাবার কাছে শোনা বেশ কিছু টুকরো টুকরো গল্প, ঠাকুমাকে দেখার ও জানার অবকাশ আমার শৈশবে – কৈশোরে – যৌবনের সন্ধিক্ষণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে একান্ত ভাবে নিজের করে পেয়েছিলাম যা এখনও মনের মণিকোঠায় কোহিনূরের মতন জ্বলজ্বল করছে। ওই স্মৃতি সাগরে ডুব দিয়ে বেশ কিছু ঘটনার মালা গাঁথতে বসেছি আজ।

১৯৪৬ সাল – ঢাকা শহরে মানুষে-মানুষে বিশাল হানাহানি, সাম্প্রদায়িক গোলযোগ, মানুষের হিংস্রতা ভরা কদর্য্য চেহারা, চারিদিকে আগুন, লাঠি তরোয়াল ভোজালির সনশনানি, মানুষের সব হারানোর বেদনায় আর্তনাদ, চারিদিকের আকাশ বাতাস ধোঁয়ায় চিৎকারে এক নারকীয় অবস্থা। যার ক্ষত এখনও ভেবেই শিউরে উঠি। এরই মাঝে এক ছোট্টখাট্ট এক যুবতী চারিদিকে ইতি উতি দেখে পৌঁছে গেল গলির এক প্রান্তে। সামনের বড় রাস্তা পেরোলেই পৌঁছে যাবে স্টীমার ঘাটায়। হঠাৎ একটি মানুষের হৃদয় বিদারী আর্তনাদ। তাকে ঘিরে বেশ কয়েকটা মানুষের পাশবিক আনন্দে, অস্ত্রের ঝলকানিতে সেই মৃত প্রায় মানুষের বেঁচে থাকার আকুতি। এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে সেই যুবতী লুকিয়ে পড়লো এক বাড়ির আড়ালে, ভয়ে পড়ে গেল হাত থেকে কাগজপত্র তবু তার চোখে মুখে বাঁচার এক অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি তাকে নিয়ে গেল রাস্তার ওপারে স্টীমার ঘাটায়। সম্বিত এল তাঁর চারিদিকে শয়ে শয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত, আহত পুরুষ নারী শিশুদের কান্না, আর্তনাদ ও বাঁচবার তাগিদের মাঝে চারিদিকে বহু প্রতিকূলতার মাঝে অদম্য জেদ ও লড়াই করার মানসিকতা সেই যুবতীকে নিয়ে এল ইস্পাত নগরী জামশেদপুরের এক বিপরীত জন-জোয়ারের মাঝে। এই ভয়াবহ ছবি আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন আমার বাবা কোন এক সময় যখন সেই লড়াকু যুবতী তার জীবনের নানা বন্দরে ধাক্কা খেতে খেতে সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করেছেন।

স্কুল শিক্ষিকার চাকরি পেয়ে আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার একটা অদ্ভুত চেষ্টা এবং জেদ তার চেহারায় আভাস ফুটে উঠলো কিন্তু মুখে সেই মিষ্টি হাসি লেগেই থাকতো। সব ছাত্র ছাত্রীদের কাছে সেই প্রিয় অসীমাদি আমার ঠাকুমা। কিছুটা সুখ কিছুটা স্বস্তি তাঁর জীবনে আনলো বেশ কিছুটা স্থিরতা। বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে তিনি উত্তর প্রদেশের ঝাঁসিতে চলে যান। পুত্র সন্তান জন্মের পরেই আবার ঘুরে এল নিকষ অন্ধকারের দিন। স্বল্প রোগ ভোগের পরেই হঠাৎ অকাল মৃত্যু হল মাত্র ৩৪ বছর বয়সে তাঁর সদা হাস্যময় সমাজ সংস্কারক ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর (আমার ঠাকুরদা)। দু বছরের শিশুপুত্র এবং শ্বশুরমশাইকে নিয়ে আবার শুরু হল আমার ঠাকুমার কঠিন সংগ্রাম।

হারিয়ে গেল স্বামী স্ত্রীর বেহালা ও সেতারের সুরেলা মূর্ছনা। হারিয়ে গেল ছোট্ট শিশু সন্তানকে ঘিরে তাঁদের আনন্দ স্বপ্নমাখা দিনগুলি। আবার শুরু হল বেঁচে থাকার লড়াই, শিশুপুত্রকে সুন্দর আদর্শে মানুষ করার অথত প্রচেষ্টা – সঙ্গে

পেলেন তাঁর প্রণম্য দিদিকে যিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করলেন বোন এবং সেই ছোট্ট শিশুপুত্রের জন্য। এই বাচ্চাটি বড় হতে লাগলো তার দুই মায়ের মাঝে। ধীরে ধীরে – সৎ শিক্ষা, কঠিন প্রতিকূলতার মধ্যে সংগ্রামী চেতনা, সেই শিশুটির হৃদয়ের অন্তঃস্থলে এক জেদী মহীরুহের বীজ বপন করলো। এবার কিছুটা শোনা যাক সেই ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা কিশোরের (আমার বাবা) জীবন স্মৃতির কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত।

"জানিস ঊর্মি তখন আমি বেশ ছোটো ক্লাস ফাইভে পড়ি, মা মাসীর ছোট্ট টিচার্স কোয়ার্টারে দড়ির খাটিয়া, শক্ত বিছানায় বেশ ঘুমোচ্ছিলাম, হঠাৎ ঘুম গেল ভেঙে। ঘুম জড়ানো চোখে আমার হাত খুঁজতে লাগলো স্নেহশীলা মায়ের কোমল স্পর্শের খোঁজে কিন্তু কি হল মা কোথায়? ঘরে জ্বলছে টিমটিমে আলো (যাতে আমার ঘুম না ভাঙে), চোখে পড়ল পায়ের কাছে মা তাঁর কিছু পড়ার বই আর কলম নিয়ে গভীর মনোযোগে পড়াশুনায় ব্যস্ত আছেন। মা শুরু করেছেন আবার পড়াশোনা কুড়ি বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর স্কুল গণ্ডি পেরোবার পর আবার ইন্টারমিডিয়েট পাশের প্রচেষ্টা। খুব সকালে উঠে আমার স্কুল যাওয়ার প্রস্তুতি, মা এবং মাসীর স্কুল যাওয়ার (মার স্কুল ছিল বহুদূরে, বাস পাওয়া যেত না, ৩ কিলোমিটার হাঁটতে হত)। জীবিকার জন্য ব্যস্ততা ও তার সাথে সংসারের কাজ – সাথে দুই বোন, বৃদ্ধা মা ও প্রিয় সন্তানের পড়াশোনা এই নিয়ে খেয়ে পরে দিন কাটতো কোন রকমে। তাই তো শুরু করলেন মেশিনে নানারকমের সেলাই, উলকাটায় সোয়েটার ও মাফলার বোনা, কিছুটা হলেও অর্থের যোগান তো দেয়, তাই প্রথম রাতে সন্তানকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন কিন্ত মাঝরাতে আরো এগিয়ে যাওয়ার তাগিদ তাঁর সাফল্যের সাথে ইন্টার ও তার পরে স্নাতক হওয়া। এক সময় খুব ভাল আঁকতেন আমার ঠাকুমা যা কেড়ে নিল ঢাকার সেই পৈশাচিক ঘটনা। কাঠ কয়লার আঁকা একটি মেয়ের ছবিটি কোন রকমে অল্প স্বল্প জিনিসের সাথে উদ্ধার পেয়েছিল ঠাকুমার ঢাকা থেকে বিপজ্জনক যাত্রার পথে। ছবিটির মায়াবী চোখ এখনো আমার সাথে কথা বলে। একটি অসম্ভব অঙ্কন প্রতিভা অঙ্কুরেই নষ্ট হল মানুষের আসুরিক শক্তির কাছে, সুরেলা আঙ্গুলগুলো সেতারের তারে আর খেলা করলোনা সুরের মূর্ছনায় তার প্রিয়তমের অকাল মৃত্যুর কঠিন আঘাতে ।" কিন্তু দশ হাতে মা দুর্গার মতন বিভিন্ন জীবন পর্যায়ে ঘাত-প্রতিঘাত, উপহাস করতে থাকা আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে কঠিন জেদি মানসিকতায়, মিষ্টি স্বভাবের ছোট্ট সুন্দর হাসির পেছনে লুকিয়ে ছিল তাঁর অসম্ভব হার না মানা শক্তির বিচ্ছুরণ। তাই তো ভুলিনি আজও সেই মহীয়সীর নারীর বৃদ্ধাবস্থায় অনেক শারীরিক প্রতিকূলতার মাঝে আমাদের ছোট্ট পরিবারে তার অধিনায়কোচিত নিজ পরিবারকে একসূত্রে বেঁধে রাখার এক অদম্য সাহসিক প্রচেষ্টা।

সেই অকুতো ভয়, প্রাণশক্তির বিচ্ছুরিত, স্নেহভরা চোখদুটি আমাকে এখনো তাঁর সংগ্রামী চেতনার উপলব্ধি করায়। আজ সেই আমার স্বচক্ষে দেখা দুর্গারূপিণী নারীশক্তির প্রতিরূপ, আমার অতি প্রিয় ঠাকুমার স্মৃতিতে সশ্রদ্ধ প্রণাম ও হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করি।

মিত্রা দত্ত

টিকটিকি

পুরুষদের কথা আমি ঠিক বলতে পারব না কিন্তু একটি বিষয়ে প্রায় সব শ্রেণীর মহিলাদলে আমি নিজগুনে সামিল হতে পারি, সেটি হল আরশোলা আর টিকটিকিকে কাছাকাছি দেখলে যথাসম্ভব আতঙ্কিত আর্তনাদ করে থাকি আমিও। আরশোলা বা টিকটিকি কেউই মানুষ খায় না, কিন্তু যদি কোনক্রমে তাদের সামনে পড়ে যাই – সুন্দরবনে বাঘের সঙ্গে তুলনা না করেও বলি, ঘাড়ে এসে না পড়ার প্রার্থনা কম জোরালো হয় না।

কিন্তু সংসারে থাকব আর কস্মিনকালেও এই দুই জীবের কারো সাথে মোলাকাত হবে না তা কি হয়! এখনও হোমমেকার সম্প্রদায়ের হোমমেকিংয়ের শত যত্ন সত্ত্বেও লুপ্তপ্রায় প্রজাতি হিসাবে মিউজিয়ামে পৌছতে তাদের বেশ দেরী আছে।

রাতের সব তারাই থাকে দিনের আলোর গভীরে, এই জীবগনও সেরকম – যতক্ষণ না মনে করিয়ে দিতে সামনে এসে উপস্থিত হয়।

আজ এসেছে সেইদিনটি, সকালে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে দু পা পিছিয়ে এলাম সভয়ে। সিঙ্কের ঠিক পাশের দেওয়ালে বেশ মোটাসোটা, তুলনায় ফর্সা – টিকটিকি। মাথাটা একটু উঁচু করে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, আমি কিছুক্ষণ আগে এসে ফ্রিজ খুলেছিলাম, তারপর এগিয়েছি রান্নাঘরের দিকে। হয়ত ততক্ষণই সে তাকিয়ে আছে অপলক, যদিও তাদের পলক ফেলার ব্যর্থ অপচয় নেইও –

আমার প্রতি এই দুর্লভ দৃষ্টিপাতে শিহরিত হলাম ঠিকই কিন্তু সে শিহরণ অন্য। একটু আর্তনাদও বেরিয়ে এসেছে নিজের অজান্তেই।

আমার আর্তনাদ শেষ হওয়ার আগেই তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল কলকল করে হেসে ওঠার শব্দ। আমি ঘাড় না ঘুরিয়েও বুঝে গেলাম মার্থা এসে গেছে। এই হাসির শব্দে মার্থা বিখ্যাত। যখন তখন হেসে ওঠে এভাবে আর একবার হাসতে শুরু করলে থামতেই চায় না।

অত হাসি না পেলেও আনন্দ হল আমারও। মার্থা মনে হয় টিকটিকিকে ভয় পায় না। সিঙ্কে যাবে আর টিকটিকি তাড়াবে। মার্থা হাসতে হাসতে সিঙ্কে গিয়ে হাত ধুতে ধুতে বলল, "বউদি ভুত দেখেছে।" কেননা আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে টিকটিকিটাকে দেখেছে ও। ততক্ষণে আরো গা শিরশিরানি দৃশ্য দেখলাম, মুখের ভেতর থেকে এইটুকু একটা লাল জিভ বার করে টিকটিকিটা ছিটকে আসা দু একটা জলের রেখা চাটতে শুরু করেছে।

আমি চোখ বন্ধ করে বললাম, "ওটাকে তাড়াও।"

সে আরো জোরে জোরে হাসতে লাগল। যেন খুব মজার ব্যাপার। বলল, "এটা ঠিক বলা টিকটিকি।"

আমি চোখ খুলে বললাম "মানে?"

মার্থা বলল, "কেন, টিকটিকির ঠিক ঠিক ঠিক শোননি?"

বললাম, "ওটা ওদের ডাক।"

"হ্যাঁ ডেকেই তো বলে কোনটা ঠিক হবে।"

মার্থা বলল হাসতে হাসতে।

হ্যাঁ, এটা আমিও শুনেছি যে কোনও কথার মধ্যে টিকটিকি ডেকে উঠলে সেটা সত্যি হয়। তবে এটা স্রেফ কথার কথা।

মার্থাকে দেখে টিকটিকি ভয় পায়নি। বরং শরীরটাকে টান টান করে লেজটা একটু উঁচু করে যেন যুদ্ধং দেহি ভঙ্গি করে জল খেতে ব্যস্ত। আর ওটাকে তাড়াবার চেষ্টা করছেও না সে। মার্থার উপর এবার একটু রাগ হল আমার। যে দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছি না তা দেখে হ্যা হ্যা করে হাসছে। সাধে আর সবাই ওকে পাগলী বলে না।

মার্থা আমার বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে এই বিল্ডিং এর প্রায় সব বাড়িতেই কাজ করে, কিন্তু আমার এখানেই থাকে বেশীর ভাগ সময়, রাতেও থাকতে চেয়েছিল – কুনাল কিছুতেই রাজি হবে না জানতাম তাই না করেছি। এখন ও মুখার্জ্জী মাসীমাকে দেখতে ওখানে থাকে রাতে, তাদের দেখার লোক দেশে গেছে বলে, এর আগে ছিল মজুমদারের বাড়ি, মেয়ের বাচ্চা হয়ে তিনমাস হবার পর মার্থাকে জবাব দেয় ওরা। তার আগে তিনতলার রোকেয়ার পা ভেঙ্গেছিল – সেখানে রাতে ছিল মাস দুই – এভাবেই চলছে ওর এই তিন বছর বা তার বেশীও হতে পারে। যখন কোথাও কিছু থাকে না ও পাঁচতলার চিলতে সিঁড়িঘরে থাকে। ওখানেই ওর জিনিসপত্র যেটুকু, রাখা আছে। এখন এই বিল্ডিংটাই ওর সব। আর কেউ কোথাও আছে বলে মনে হয় না।

এক সকালে মেয়েকে স্কুলের গাড়িতে ছেড়ে বাজার করে ফেরার পথে মার্থাকে প্রথম দেখেছিলাম। একমাথা উস্কোখুস্কো চুল, প্রায় ছেঁড়া ছেঁড়া নোংরা পোষাক, খালি পা মার্থা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল কাজের লোক চাই কি না। না বলাতেও একগাল হেসেছিল। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিল একটু মুড়ি টুড়ি দেব কি না, দিন দুই খাওয়া জোটেনি তার।

এটা একটা পুরোনো টেকনিক জেনেও কেন যেন ফেরাতে পারিনি। এনে রুটি তরকারি দিয়েছিলাম। আমার পড়ে থাকা সব এঁটো বাসন মেজে দিয়েছিল হাসতে হাসতে। বলেছিল, "এত বেলায় মাসী আসবে না, আজ ডুব দিয়েছে।"

বাংলা বলে কোন প্রাদেশিক টান ছাড়া।

পরের দিন দেখি গেটের কাছে বসে আছে। আমার পেছন পেছন গিয়ে বাজারের ব্যাগ কেড়েকুড়ে বয়ে আনল। আবার সেই বাসি রুটি তরকারি খেয়ে বসে বসে মোচা বাছল। কলকলিয়ে হেসে বলল, "রান্নামাসী গজগজ করবে না আর।"

কুনালকে এই গল্পটা করেছিলাম, শুনে বারণ করল। অনেক সময় এদের ডাকাত দলে যোগ থাকে। বাড়ি দেখে শুনে যায়। আমি এত বোকা কেন !

গেটের কাছে আস্তানা গেড়েছে সে।

সকালে বেরোলেই দেখা। আমি মার্থাকে বারণ করলাম সঙ্গে বাজারে যেতে। বুড়ো দারোয়ানকেও মানা করে গিয়েছিল কুনাল, যেন ঢোকে না, ও তাই বসে রইল রাস্তার ধুলোতেই।

মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিল রাতে, আর সঙ্গে বাজ পড়ার বিকট শব্দ। সকালে অবশ্য মেঘ কেটে পরিষ্কার আলো ফুটল, আমি রিংকিকে নিয়ে বেরোলাম। রাতে মনে পড়েনি, গেটের কাছে এসে মনে পড়ল মার্থার কথা, কিন্তু কেউ কোথাও নেই। দারোয়ান বলল জানে না, হয়ত চলে গেছে কোথাও। মেয়ে ছেড়ে বাজার সেরে ফিরে এসে ঢুকছি, মার্থা ভুতের মত উদয় হল। একেবারে সত্যি ভুত যেন, এমন চেহারা হয়েছে। ভেজা মাথা গা তখনও শুকোয়নি, সারা গায়ে নোংরা

ঝুলকালি, দারোয়ান চোখ ফিরিয়ে নিল ওর পোষাকের দুরবস্থা দেখে। হাসতে হাসতে জানাল, বৃষ্টিতে লুকিয়ে পড়েছিল ও নতুন বানানো নোংরা ফেলার বড় ডাস্টবিনটার মধ্যে।

অসহায় মনুষ্যজীবনের এতটা অবমাননা সহ্য হল না। কুনালকে বললাম চোরদের দলে এসব লোকজন নেবে না।

খুব ঘরোয়া ফ্ল্যাটবাড়ি, তাই ঘরে ঘরে গিয়ে বললাম, দিদি-বৌদি-কাকাবাবু-মাসীমা-ও থাকুক না হয়।

কেননা আমার একার পক্ষে পুরোপুরি ওর দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। কাজের লোকের অভাব চিরকাল এই ফ্ল্যাটে, কাজ করে দিব্যি চলে যাবে ওর একার পেটটা, পয়সা হোক না হোক খাওয়াটা তো জুটে যাবেই।

– "কি হল বলতো। তখন থেকে চুপ করে আছ। টিকটিকি দেখে মুচ্ছো গেলে না কি ?"

মার্থা হাসতে হাসতে আমাকে হালকা করে ছুঁয়ে বলল।

টিকটিকিটা আরো সামনে চলে এসেছে। রাগটা চট করে কেমন বেড়ে গেল। বললাম, "সারাক্ষণ এরকম হ্যা হ্যা করে হাসো বলে ভেবোনা কেউ ভাল বলে। কাজের তো কিছু করনা, রাজ্যের পাগলামি আর বাজে কথা। ধুর্।"

মার্থা কেমন চমকে উঠল। মাথাটা নীচু করল। মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে।

কয়েক মিনিট হবে, তারপর চুপচাপ একটা পুরোনো পেপারকে পাকিয়ে সরু লম্বা করে সেই বেয়াড়া টিকটিকি তাড়াতে লাগল ও। আমি শোবার ঘরে গিয়ে বিছানার চাদর ঝাড়তে যাব ও ছুটে এসে চাদর তুলে ঝেড়ে পেতে অগোছালো ড্রেসিংটেবিল গুছিয়ে ঝাড়ন দিয়ে সব ঝেড়ে ঠিক করতে লাগল। এমনিতে ও কাজ করে তাড়াতাড়ি কিন্তু আজ এমন ছটফট করে করতে লাগল যে আমার তখন কেমন খারাপ লাগল। না বললেই হত। বড় অস্তিত্বের সংকট বেচারার।

রান্নাঘরে এসে দেখলাম সিঙ্কের পাশে কটা কুমড়োফুল ধুয়ে রাখা। কুমড়োগাছটা খুব মুশকিল জায়গায় হয়েছে, পাঁচিল আর টানা লম্বা কমন গ্যারাজের একচিলতে ফাঁকে জন্ম, তবু পাঁচিলের গায়ে খুব লকলকিয়ে বেড়েছে, কিন্তু পাঁচিলের ওপর খোঁচাখোঁচা তারকাঁটা আর নীচে রাজ্যের ভাঙা ফাটা জিনিস ডাঁই করে রাখা থাকে বাতিল সংগ্রহকারীদের অপেক্ষায়।

কাঁচের টুকরো থাকতেই পারে। একদিন কুমড়োফুল দেখে আগ্রহ দেখিয়েছিলাম। জানতাম তোলা অসম্ভব। কিভাবে পেড়েছে মার্থা কে জানে!

ও চা করল একেবারে চুপ করে। অন্যদিন আমি চা খাই না, ও-ই খায়, আজ খুব যত্ন করে নোনতা বিস্কুট সাজিয়ে চা দিল আমাকে, না করতে পারলাম না। নিজের চা নিয়ে মেঝেতে গুছিয়ে বসে বলল, "তুমি কতদিন জিজ্ঞাসা করেছ, আমি কিছুই বলিনি আমার কথা। আজ এই টিকটিকিটা দেখে মনে হচ্ছে আমার কথা তোমাকে বলা উচিত এবার।"

– "টিকটিকি !"

– "জামতাড়ার নাম কি শুনেছ? খুব বড় জায়গা না, আমাদের বাড়ি ওইখানে, ছোট কইলাপুর গ্রামটার নাম, এর বেশি কিছু জানিনা। আমরা সাঁওতাল জাতে কিন্তু ধর্ম খ্রিষ্টান। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে শুধু দিদিকেই দেখেছি। রুথমেরী নাম ছিল। ছিল – এখন নেই।"

বাবা ছোটবেলায় আমাদের গির্জায় দিয়ে দেয়, এত ছোট যে সে আমার মনে নেই কিছুই। আমার যা শোনা আর

বোঝা সব বড় হয়ে। ফাদার বাংলা বলতেন, বাকিরাও বাংলা বলত, আমিও বাংলা বলতাম – বাংলা লিখতাম গির্জার স্কুলে। আমি ছোট থেকে খ্যাঁদা মোটা কালোকোলো, কিন্তু দিদি ছিল সুন্দর।

আমাদের হাতের কাজ শেখানো হত যেমন ঝুড়ি বোনা, দড়ির পাপোস বানানো, তুলো ভরে পুতুল, আমরা খুব ভালো ছিলাম ওখানে। দিদির থেকে আমি অনেক ছোট, দিদিই আমার কাজ বেশি করে করে দিত।

একদিন একটা আধবুড়ো লোক এল। শুনলাম বাবা মরে গেছে। মা তো ছিলই না। দিদি তো আমাকে ধরে খুব কাঁদছে, লোকটা বলল – বাবা নাকি তাকে বলে গেছে আমাদের নিয়ে যেতে। সে বাবার ভাই। ফাদার বললেন, ওরা এখানেই ভালো আছে। লোকটা শুনলই না। বলল, আপনি আটকে রাখতে পারেন না।

তার বাড়িতে গেলাম আমরা। সেটা আমার অত মনে পড়ছে না কেননা ক'দিন পরেই লোকটা আমাকে আর দিদিকে নিয়ে বেরোল। বলল, আমাদের ভালো জায়গায় নিয়ে রাখবে। দিদির খুব পড়ার ইচ্ছে, সেখানে পড়া গানবাজনা সব হবে।

আমাদের সেই শান্ত নিরিবিলি গ্রাম ছেড়ে অনেকক্ষণ ট্রেনে আর বাসে চেপে যেখানে পৌছলাম সেটা একটা লোকজন গিজগিজে জায়গা। বাজার দোকান চারদিকে, মাঝে সরু গলি, গলিতে চলা আর শেষ হয় না। শেষে একটা অন্ধকার মতো বাড়িতে নিয়ে গেল। অনেক মেয়ে, মোটা বুড়িমত একজন – লোকটা আমাদের সামনেই বুড়িকে বলল, দাও এবার টাকা, দিয়ে গেলাম দুটোকেই।"

মার্থা চুপ করে গেল।

তাকিয়ে দেখলাম ও মুখ নীচু করে আছে। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে মেঝেতে, একখন্ড কালো পাথরের মতো বসে রইল এভাবে কিছুক্ষণ।

"আমি তো ছোট, বুঝতে পারিনি তারপরের কথা। তবে দেখতাম দিদিকে আসতে দিত না আমার কাছে। আর ওরা মারত ওকে। আমি কাঁদতাম, আমাকেও মারত। পরে বুঝেছিলাম আমি এত ছোট যে আর কিছু করতে পারত না। শুধু মারতে পারত। দিদি আমাকে দেখলেই বলত – পালাব, দাঁড়া।"

তারপর একদিন খুব চীৎকার করছে সবাই ... কি, না দিদি কিভাবে যেন ছাদে উঠে গেছিল। লাফ মেরেছে সেখান থেকে। অনেক নীচে পড়ে একেবারে শেষ। আমাকে ফেলে একা পালিয়ে গেল দিদিটা।

কি করে যেন পুলিশ চলে এসেছিল। দিদি মরে পড়ে আছে, আমি পাশে বসা, আর সব মেয়ে আর মাসি গেছে পালিয়ে, আমাকে পুলিশ নিয়ে গেল সঙ্গে। আবার একটা বাড়িতে নিয়ে গেল যেখানে আমার মতো, তারচেয়ে ছোট আর বড় অনেক মেয়ে সেখানে। বুড়িও আছে আবার একদম ছোট বাচ্চা, দুধ খায় বোতলে, সেও আছে।

একটু পড়তে পারতাম তো, পড়েছিলাম বাইরে লেখা ছিল, 'সেবা'।

ওখানেই বড় হলাম।

কষ্ট ছিল খাওয়া পরার, থাকারও জায়গা ছিল ঠেসে ঠুসে, তবু ভালোই ছিলাম। বন্ধুও হয়েছিল ক'জন। আলো, যূথী, বন্দনা . . .

কিন্তু বড় হওয়ার পর যেতে হল অন্যদিকে। বড় মেয়েরা থাকে একটু দূরের দিকে। এমনিতে সুপার দিদি একজন বরাবরই ছিল, তখন থেকে আর একজন দিদি আমাদের দেখাশোনা করতেন, সুন্দর পোষাক, চেহারা, গা থেকে কি

ভালো গন্ধ বার হত। হাঘরের আমরা সবাই হাঁ করে দেখতাম সে এলে। সে তো থাকত না, মাঝে মাঝে আসত। ভালো ভালো চেহারার লোকজন আসত তার সঙ্গে, তারা কখনও কখনও সবাইকে একসাথে ডেকে কেক, চকলেট এসব দিত। ভালো ভালো মানুষ, তাদের বউ, তাদের ছেলেমেয়েরাও আসত। ছেলেমেয়েদের হাত দিয়ে দিত যখন কেক-চকলেট – তাদের মনে হত রাজপুত্র রাজকন্যা, গীজায় বইয়ে ছবি ছিল যাদের।

ঐ সুন্দর দিদিটা মেয়েদের খুব ডেকে ডেকে গল্প করতো, যারা আমাদের থেকে বড় তাদের ঘুরতে নিয়ে যেত। তারপর তাদের নিয়ে রাখতো আরো দূরের দিকের ঘরগুলোতে। যেন বাইরে গেলেই তারা হয়ে গেল আমাদের থেকে অন্য।

যূথী বন্দনারা লাফাতো এই বলে যে আমাদের দিদি বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলেছে। কত কি দেখাবে-খাওয়াবে। কিন্তু আমাকে, খেন্তিকে, ফুলিকে পাত্তা দিত না দিদি, যূথীরা বলত "তোদের দেখতে ভাল না তাই দিদির পছন্দ হয় না। দিদি কত সুন্দর, তোদের ছুঁলে যদি কালো হয়ে যায়!" এ নিয়ে রাগ করতাম না। কালোই তো। আমাকে প্রায় রোজ রান্না করতে হত। খেতে দিতে গেলেও সুন্দর দিদি নাক ঘুরিয়ে নিত। আর সুপার দিদি রান্না ভাল না হলে এমন মারত যে গালে আঙ্গুলের দাগ বসে যেত।

তখন খুব রাগ হত। সহদেববাবু বলে একজন আসতো, মাঝে মধ্যেই,খেতে এলে সে আবার বলত, "ওভাবে দেখছিস যে বড় ... রাগ দেখাচ্ছিস? চোখ গেলে দেব।"

আমার সঙ্গে রান্না করত আলো, ও বলত, "সরে আয় এদিকে। আমরা কিচ্ছু করতে পারব না। ওরা খুব খারাপ।"

আমার তো মনে হতই ওরা ভালো না। সুপার দিদির চোখের চাউনি কেমন যেন। ঐ লোকটা, সুন্দর দিদি সবাই খারাপ। যূথীরা বলত, "তোর আসলে হিংসে হয়।"

বলতাম, "রানুদিকে দেখলি আগে কত ভালবাসত। বাইরে নিয়ে যেত। তারপর পাগলী বলে কোথায় যেন পাঠিয়ে দিল দেখলি না।"

ওরা হিহি করে হেসে বলত, "পাগলীই তো। এত ভাল জামাকাপড় খাওয়া ঘোরার পরও কেউ হাউমাউ করে কাঁদে?"

মার্থা আবার চুপ করল। আমি কোথায় যেন পড়েছিলাম অনেক জায়গাতেই মেয়েদের এই হোমগুলো নিয়ে গড়ে ওঠে এক একটা মধুচক্র। অনাথ মেয়েদের সরলতা আর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে হোমে সমাজসেবার ছদ্মবেশে মহিলা পুরুষরা এটা চালিয়ে থাকে। মেয়ে পাচারের কেন্দ্রও হয় এই হোমগুলো।

মার্থা আমার দিকে এবার তাকাল। ও বুঝল আমি বুঝেছি। বলল, "শেষটা বলি। যূথী, বন্দনা না, আলোকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। আলো আর ফেরেনি। কিন্তু ওরা ফিরে খেতে এসেছিল।

আমাদের রান্না হত একটা ঘুপচি অন্ধকার ঘরে। ঘর ভর্তি ইঁদুর, আরশোলা, টিকটিকি। দেওয়ালে ছাদে টিকটিকি ঘুরতোই দু চারটে সবসময়। ঢাকা দিয়ে রান্না করতাম যেন ছাদ থেকে খাবারে না পড়ে।

মাংস রান্না হচ্ছিল। ঠিক তার উপরে ছাদে একটা টিকটিকি, ঢাকা খুলে রাখলাম। গরম ভাপ উঠতেই ধপ করে একটা আওয়াজ হল। তারপর বেশ নেড়েচেড়ে দিয়ে এলাম খাবার টেবিলে। টিকটিকির শরীরে নাকি খুব বিষ। রাতের মধ্যেই দেখতে দেখতে তিনটে লাশ ... সুপার দিদি, সুন্দর দিদি আর সহদেববাবুর। তারপর পুলিশ এল। খাবারে বিষ পাওয়া গেছে। আমাকে ধরল পুলিশ, রান্না আমি করেছি। নিয়ে গেল থানায়, জেলে রেখে বিচার করল। বলল, অনিচ্ছায়

খুন। খাবারে ইচ্ছে করে বিষ মেশাইনি। যদিও ইচ্ছা করেই করেছিলাম। কটা মেয়ে বেঁচে তো গেল । জেল হল সাত বছর।"

"হ্যাঁ বৌদি। জেলখাটা আমি।"

উঠে দাড়িয়েছে মার্থা, "যেদিন তোমার সাথে দেখা হল তার একমাস আগেই ছাড়া পেয়েছি। কিন্তু যাব কোথায়, খাব কী ? তা, কত আর কাঁদব ? কান্না ছেড়ে হাসি ধরলাম সেই থেকে। লোকে পাগলী ভাবত জানি ও।"

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অমনি। মনে মনে এত দীর্ঘ অতীত সফর করে যেন ক্লান্ত। তারপর সে তার নিজের পুঁটলিটা নিয়ে এল।

"লুকিয়েছিলাম সব কথা। জেলের কয়েদখাটা মানুষকে ঠাঁই দেবে! তোমাকে কোনদিনও ভুলব না। তোমার এখানে আমার জীবনের সেরা তিনটে বছর। খুব ভালো হবে তোমার, দেখো।"

মার্থা বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, "আচ্ছা, হল সব। আর কুমড়োফুলের বড়া কে করবে এখন ? জবার মা তো কোনকালে চলে গেছে।"

সে আমার দিকে ঘুরে তাকাল। চুপ ঠিক দু মিনিট। তারপর চোখভরা জল নিয়েই কলকল করে হেসে উঠল, "বলল, আমি জানতাম। তোমার দয়ার শরীর। আমাকে যেতে দেবেই না।"

জানলার বাইরে থেকে টিকটিকি ডেকে উঠল ... ঠিক ঠিক ঠিক।

সোমা ঘোষ (চক্রবর্তী)

আলো

নিজে চাবি খুলে ঘরে ঢুকে আসার স্বভাব এবাড়ির দুজনের। কে আগে আসে কে পরে তার ঠিক নেই। টিকলির একটু ইচ্ছে হয় রনি ঢুকলে একবার উঠে আসে। একটু জল এগিয়ে দেয়। তারপর ক্লান্তিতে সোফায় এলিয়ে সেল ফোন নিয়ে এটা সেটা দেখতে থাকে।

এই সময়টা মায়ের ফোন আসে। নিয়ম করে মায়ের এক প্রশ্ন, টিকলির একই উত্তর।

– জ্যাম ছিল নাকি রে, আজ দেরি হল যে !

– দেরি কই – রাশ আওয়ারে রাস্তা কবে আর খালি থাকে।

– টিফিনে কি খেলি ?

– ওই ক্যান্টিনে ...

– একটু ঘরের খাবার নিতে পারিসনা ? আরতিকে বললেই করে দেয়। তোরা নিজেরা পারবিনা, একটু কাজ করিয়ে নিতেও জানিসনা।

– মা! আমি ঠিক খেয়েছি –

– ওইতো রোজ স্যাণ্ডউইচ – সেটা ঘরে করলে মাচ বেটার, তাই না ?

– তোমরা ঠিক আছো ? বাবার চশমা পেলে ?

– জগন্নাথ কাল আনবে। আমার আজ এনজিও র মিটিং শেষ করতে দেরি হল, ততক্ষণে দোকান বন্ধ।

– ঠিক আছে রাখি।

– শোন টিকলু, তোর বাবা আর আমি খুব চিন্তা করি রে। এবার ট্রাই কর – পাঁচ বছর হল বিয়ের।

– প্লীজ মা, ওই এক কথা তোমার। রাখি।

– রাখো।

– মা!

– কি ?

– মা, রাগ কোরোনা। এই সময়টা কেরিয়ারটা ইম্পর্টান্ট। পড়াশোনা প্রাইয়োরিটি এই বলে চিরকাল কত এনকারেজ করলে – আর একটু সময় দাও। আমরা দুজন এখনও রেডি না।

– রনির মাও ভালো ভাবে নিচ্ছেন না। উনি কিন্তু তোমার দোষ ভাবছেন। আমি এই নিয়ে আর বলব না – তোমরা এডাল্ট নিজেরা বোঝো। মনে রেখো তোমার বয়েসে আমি কিন্তু দশ বছরের মেয়ের মা। আমি কেরিয়ার করিনি, নাকি তোমায় মানুষ করিনি ? সময়ের সাথে প্রাইয়োরিটি বদলাতে হয় টিকলু। রাখি।

রোজ “বলবনা” বলে তারপর একই জায়গায় এসে রাগ করে। মা ফোন রাখলে টিকলি ভাবে, মা, তোমার মত আমি এত পারিনা – পারতে চাইনা। আমাদের সব পারতে কেন হবে বলতে পারো ? একটু কম পারব, কম বুঝব – এমনটা হতে পারেনা ? জীবনের সমস্ত পারফরমেন্সে একশোয় একশো স্কোর করতে হবে এ কেমন আশা জগতের। স্ক্রীনটা ঝাপসা লাগে। চোখ ব্যথা করে, এতক্ষণ কম্পিউটার তারপর আবার ফোন। ক্লান্ত মাথাটা সোফায় এলিয়ে দিয়ে চোখ বোজে। চোখটা একটু লেগে আসে। বন্ধ চোখের মধ্যে কিছু আবছা দৃশ্য ঘোরে ফেরে। একটা টিলার ওপর আপ্রাণ চেষ্টায় কিছুতেই উঠতে পারছেনা কে যেন। কে ও ? মনে হয় ওটা ও নিজেই যেন ! কেমন ভয় পাওয়া মুখ। কারা তাড়া করেছে। ধেয়ে আসছে। ওপরে ওঠা দরকার খুব – পারছেনা।

কিচেন থেকে ফুটবল কমেন্ট্রির আওয়াজ লিভিং রুমের দিকে এগিয়ে আসে। চমকে চোখ খোলে টিকলি – ভুল ভাল স্বপ্ন যত।

রনি কিছুতে হেডফোন ইউজ করবে না। কাজ থেকে ফিরে ফ্রেশ হয়ে নিজের কালো কফি বানিয়ে নিয়ে এসে বসে উল্টোদিকের সোফায়। দু এক কথা হয় দুজনের, তারপর রনি সেল ফোনের স্ক্রীনে ডুবে যায়।

রনির সেল ফোন বাজে।

– হেলো, পিঙ্কি বল।

– দাদা, বাবার বুকে একটা পেন দুপুরে খাবার পর থেকে, লেফট সাইডে। কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে মনে হল। ইমিডিয়েট চেকআপ লাগবে।

– সেকি !

– আমি কল করেছিলাম তখন মা বলল। সিরিয়াস কিন্তু দাদা, তুই কিছু কর – এত দূরে আমি প্লীজ ...

– এখনি যাচ্ছি। রাখ পিঙ্কি, ভাবিস না।

সোফায় ফোনটা ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে ওঠে, “টিকলিইই, টিকলিইইই এখনও ফোন নিয়ে বসে আছো ? শুনতে পাচ্ছনা বাবার চেস্ট পেইন ?” বলেই টিকলির উত্তরের অপেক্ষা না করে ঘরের দিকে ছোটে চট করে চেঞ্জ করে নিতে। ফিরে এসে দেখে টিকলি ওভাবেই সোফায় বসে হাতে ফোন।

মাথায় আগুন চড়ে যায় রনির। আপাত শান্ত রনির বাবা, মা, বোন – বোনের পরিবারের কারো বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলেই মাথয় আগুন চড়ে যায়। অদ্ভুত ভাবে তখন সব রাগ এসে পড়ে টিকলির ওপর। যেন টিকলির দোষেই সব সমস্যার সূত্রপাত।

টিকলি বিয়ের প্রথম দিকে বিহ্বল হয়ে যেত। কি করবে ঠাহর পেত না। রনি ওকে আঘাত করে যেত মাঝে মধ্যেই। বিশেষ করে বাড়ির লোকের সামনে এটা প্রায় সবসময় ঘটতো। অভিমান হত, কান্না পেত। নতুন বিয়ের পর মানিয়ে নিতে চায় সব মেয়েই। আইটি প্রফেশনাল টিকলিও কাউকে কিছুই না বলে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। তার অপরাধ কোথায় বুঝতে চাইত। প্রতিবাদ, বোঝানো, একটু আধটু সেসব চেষ্টাও করেছে।

কিন্তু দেখেছে এসব আক্রমণের মধ্যে অদ্ভুত কিছু প্রত্যাশা থাকে। বউকে বাড়ির সবক'টা মানুষের মন বুঝে ভেবে তেমন ভাবেই সব কাজ করতে হবে। টিকলি ঘরের কাজে পটু নয়। একটু আলসে, কিছুটা অমিশুক। তবে ভালোবাসা পেলে ভালোবাসা দিতে জানেনা এমন নয়। কেন ওকে বুঝতে পারেনা ওরা ? কিসের এত প্রত্যাশা ওর ওপর ? এসব প্রত্যাশা রনির কাছে তো নেই, পিঙ্কির কাছেও না। বউ হয়ে এসে ও আলাদা কেন সেটা কিছুতেই মাথায় ঢোকেনা টিকলির।

এমন নয় যে টিকলির সব দিনগুলো অশান্তময় হয়ে কাটে। শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সাথে থাকা তো রোজকার ব্যাপার নয়। মাঝে-সাজে আসা যাওয়া। কিন্তু একসাথে হলেই এসব বেশি ঘটে। অন্যসময় দুজন বিন্দাস থাকে তো।

একবার পিঙ্কির মেয়ে আবদার করল মামির ঘরে শোবো। টিকলি আদর করে ছোট্ট তুলতুলকে নিয়ে গেল বিছানায়। মেয়ে কেঁদে বলল, "মা কে ডাকো, আমার মা চাই"। টিকলি ওকে কোলে তুলে পিঙ্কিকে দিয়ে বলল, "মেয়ে তোমায় ছাড়া শোবেনা, দিদি"। এই বলে আবার নিজের বিছানায় ফিরে গেল। ইতিমধ্যে তুলতুল আবার কান্না জুড়ল মাকে নিয়ে মামির ঘরেই সে শোবে। ততক্ষণে ক্লান্ত টিকলি ঘুমিয়ে পড়েছে। পিঙ্কি মেয়েকে সামলাচ্ছে, "এখানে ঘুমোও। কাল মামির ঘরে শোবো তুমি আর আমি।" "নাআআ আজ আআআজ আজ শোবওওও।"

এবার তুলতুলের কান্না তরুণ আর রমার কানে গেল। রমা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "দুটো দিনের জন্যে কতদূর থেকে ননদটা এসেছে। কি হত ওঘরে বাচ্চাটা শুলে ? এত স্বার্থপর আজকালকার মেয়েগুলো। আমার মেয়ে এমন করলে না ... । হুঃ, পিঙ্কি এমন শিক্ষাই পায়নি যে এসব কাজ করবে।"

রনি ঘরে ঢুকেই ঘুমন্ত টিকলিকে ঠেলে ঠেলে জাগাল। "এই শোনো, ওঠ । এত ছোট মন কেন তোমার ? রোজ তো আরামে ঘুমোতে পারবে, একটা দিন বাচ্চাটাকে এঘরে শুতে দিলে কি হত ? ছি !"

– মা-ম্মানে ? তুলতুলকে এখানে এনে চেষ্টা করলাম তো। ও ঘুমোল না, কাঁদলো।

– মিথ্যে কথা বোল না। ও এঘরে শোবার জন্যে এখনও কেঁদে যাচ্ছে।

– সেকি – আসুক – আমি তো ... ওঠার উপক্রম করে টিকলি।

– থাক। (হাত ধরে ওকে আটকে দেয় রনি।) ওদের কালই চলে যেতে বলব। আমারই বাড়ি আমার দিদি এসে থাকতে পারবে না ? বাড়ি সুদ্ধ মানুষ চিনে গেল তোমায়।

– এসব কি বলছ – আমি কিছুই করিনি। হাত ছাড়ো বলছি। কেন যখন তখন আমায় অপমান করো। বিশ্বাস নেই ?

– ঘুমিয়ে পড় আর ড্রামা করতে হবে না। কিসের অভাব তোমার। সবসময় তোমায় অপমান আমি করি ? খালি কমপ্লেন ! আমি কোনটা করিনা তোমার খুশির জন্যে ? তোমার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করি, বেশি টাকা রোজগার করি সংসারের জন্যে। তোমার টাকা তো ব্যাঙ্কে বাড়ছে। এরপরেও তোমার এত দেমাক ! তাচ্ছিল্য কর আমার বাড়ির লোককে কোন সাহসে ? দুটোদিন বাড়ির বউ-এর দায়িত্ব পালন করবেনা ? একা স্বার্থপরের মত থাকবে জানলে কক্ষনো তোমায় বিয়ে করতাম না।

ঘুম উবে যায় টিকলির। এই পরিবারের প্রত্যাশার তল পায়না। ভাবে এতই যদি খারাপ সে তাহলে একসাথে থাকাই কেন ? কেন এখানে অপমান সহ্য করবে সে ? দুটো চোখ জ্বালা করে, জল আসেনা। ঘুমও আসেনা।

প্রতিদিনের চেনা হাসিখুশি রনি কেমন উদ্ভট আচরণ করতে থাকে সময় সময়। কেন যে এসব বলল তার কারণ একবর্ণ টিকলির মাথায় ঢুকল না। সারাদিন অফিস করে ঘরে ফিরেই দেখে শাশুড়ি আর আরতিদি সামলে উঠতে হিমশিম দশা। দেখেই ফেরা মাত্র কিচেনে ঢুকেছে। তারপর সবাইকে খেতে দিয়ে ওদের বিছানা করে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তবু এনেছিল তো, এমন কান্না জুড়ল তুলতুল যে ওর মায়ের কাছে দিয়ে এল – ভুলটা কি করল ? কিসের জন্যে এত তীব্র ঝাঁঝাল কথা রনির ?

দিন যেতে যেতে টিকলি ওঁদের মনস্তত্ব কিছুটা বুঝে নিয়েছে। বুঝেছে শাশুড়ি রমা কেন জানি ধারণা করে নিয়েছেন টিকলি ওঁদের পছন্দ করেনা। কিন্তু ছেলের বাড়িটা ওঁদের অধিকারের জায়গা। তাই টিকলিকে ছেলে জব্দ করলে তবেই পরিবারের মর্যাদা বজায় থাকে। রনি মায়ের তরঙ্গ বুঝে নেয় বিনা বাক্যে এবং টিকলিকে ভালোভাবে প্রশ্ন না করেই ধেয়ে আসে ওর দিকে। অনুভব করে কয়েকজোড়া চোখ ওকে সারাক্ষণ জাজ করে চলেছে। পরীক্ষায় ফেল করাটাই অনিবার্য।

সচরাচর উত্তর দেয় রনিকে, তারচেয়ে বেশি নিস্পৃহ হয়ে যায় এমন সব মুহূর্তে টিকলি। ক'টাদিন আবহাওয়া গুমোট হতে থাকলে রনি নিজেই আবার এগিয়ে এসে টিকলির মান ভাঙিয়ে দেয়। বিয়ের শুরুর দিকে অশান্তি যেভাবে মেটে, সহজেই ওদেরও মিটে যেত। টিকলি নিজেও চেষ্টা করে স্বাভাবিক হয়ে যেতে। এসব রাগ ক্ষোভকে খুব বড় জায়গা দিলে প্রতিদিনের জীবন অশান্তিময় হয়ে উঠবে। অন্য সময় রনি তেমন খারাপ মানুষ তো নয়। আনন্দময়, ভালোবাসতে পারা এক মানুষ। একসাথে মুভি দেখা, বাইরে খাওয়া, শপিং, নাটক দেখা গান শোনা। বরং এটা রনির চরিত্রের অনেক ভালর মধ্যে খারাপ একটা দিক, এমনটা ভেবে নিতে সহজ লাগে টিকলির। কোন মানুষ আর পারফেক্ট ?

সবচেয়ে বড় কথা, মানসিক চাপে থাকা টিকলির নাপসন্দ। সময় সময় রনির বদলে যাওয়াকে টিকলির সিস্টেমে ধিরে ধিরে কোথাও এডজাস্ট করে নিয়েছে হয়তো।

তবু যখন অপমান লাগে, ইচ্ছে হয় ওকে বুঝিয়ে বলে – কিন্তু লাভ হয়না। কথারা ফিরে আসে ধাক্কা খেয়ে, রনির মনে পৌঁছয়না।

আজও রনি উন্মাদ হয়ে বলতে লাগল, "এটা ফোন নিয়ে থাকার সময় না। আমার বাবার কন্ডিশন সিরিয়াস – গড ড্যাম ইট। আর ইউ আ হিউম্যান ? তোমার বাবা মা তোমায় কিছুই শেখাননি !" টিকলি উত্তর দেয়না চোখ সেলফোনে, এক হাতে স্ক্রীন স্ক্রোল করছে।

– ইউ ইনক্রেডিবল – আই হ্যাভ টু গো, ইউ গো টু হেইল।

– ওয়েট আ মিনিট – হেল্লো – বি এম বিড়লা ? ক্যান ইউ প্লীজ পুট মি টু ডঃ রয় ? ওকে।

দরজায় থমকে যায় রনি – কথা বলে না টিকলি, ওকে ইশারায় অপেক্ষা করতে বলে। যেন এতক্ষণ রনির বলা কথা ওর কানেই যায়নি। কোনও রিয়্যাকশন নেই।

– হেলো আঙ্কল, টিকলি বলছি, ড্যাডির – মানে রনির বাবার সিভিয়ার চেস্ট পেইন আজ দুপুর থেকে।

– আই সী ! নিয়ে চলে এস আছি আমি দশটা অবধি –

– নিয়ে যাব ?

– বাড়ির গাড়িতে পারবে ? নাহলে জানাও এম্বুলেন্স পাঠাচ্ছি।

– মনে হয়না – লাগে যদি জানাচ্ছি এখনই।

কল কেটে আবার নতুন কলে রিং হবার আওয়াজ।

– হেলো মাম্মী, ড্যাডি কেমন আছে ?

– টিকলি, রনি কখন আসবে ? সন্ধ্যে থেকে তোমার ড্যাডির বুকে চাপ ব্যথা।

– মাম্মী, ড্যাডিকে বি এম বিড়লা নিয়ে যেতে হবে – জগন্নাথ যাবে গাড়ি নিয়ে। তোমরা দুজন পারবে তো ?

– আজই ? এখন একটু বেটার। কাল সকালে হলে ... রনি কোথায় ?

– এখনই যেতে হবে মাম্মী। আমরা ডক্টরের সাথে কথা বলেছি। আমি আর রনি ডিরেক্টলি হসপিটাল যাচ্ছি। ড্যাডির টুকিটাকি গুছিয়ে দাও, চেঞ্জ করে নাও চটপট, জাস্ট ইন কেস ... নাহলে তো দেখিয়ে ফিরে আসব। রাখি।

আবার নতুন কল –

– হেলো মা, জগন্নাথ কোথায় ?

– কেনরে ? এইতো একটু আগে বাজার নিয়ে এল। এখন বাবু টিভি দেখছেন।

– ওবাড়ির ড্যাডি সিরিয়াস, এখনি জগন্নাথকে বল ওঁদের তুলে নিয়ে বি এম বিড়লা যেতে হবে।

– মাই গড! এই টিকলি, বলিস কি ? আমার তো বুক কাঁপছে শুনে। আমরা যাব ?

- না। ভীড় বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি আর রনি আসছি।

সারা রাস্তা চুপচাপ রনি ড্রাইভ করল। একটা কথাও বলেনি।

ইসিজি রিপোর্ট অনুযায়ী তরুণের ইতিমধ্যে দুটো মাইল্ড এটাক হয়ে গেছে এবং লেফট মেইন আর্টারিতেই সিভিয়ার ব্লকেজ। ইমিডিয়েট বাইপাস লাগবে।

এমার্জেন্সি অপারেশন করে সেযাত্রা বাঁচিয়ে দেওয়া হল তরুণকে।

রমা টিকলির ওপর কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলেন। কোথাও একটা অনুতাপ এল ওঁর মনে পুরোনো ব্যবহার মনে করে। খুব একটা প্রকাশ না করলেও টিকলির সাথে আচরণ নরম হয়ে এল। রমা আর তরুণ এসে দুটো মাস টানা রয়ে গেলেন রনি আর টিকলির সংসারে। দুবেলার আয়া রাখা হল। শুরুতে দুজনে পালা করে ছুটি নিয়েছিল। ক্রমে কাজে ফিরে গেল দুজন।

রনি বেশ চুপ করে গেছে। টিকলির প্রতি অনুতাপ প্রকাশ বা এমন কোনও লক্ষণ নেই একেবারেই। উত্তাপও নেই। কেমন যেন ঠান্ডা মেরে গেছে দুজনের সম্পর্কটা। টিকলি স্বাভাবিক। ও জানে এমন কিছুই ও করেনি যার জন্য বাহবা পেতে হবে, আশাও করেনি। যদিও শ্বশুরমশাই টিকলির উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করেছেন পঞ্চমুখে। সেই রাতটা বাড়িতে রাখলে কি হত তা বলা যায়না। টিকলি ভাবে, সাধারণ একজন মানুষ যা করতে পারত ও তাই করেছে। করতে পেরেছে ডঃ রায় বাবার বন্ধু বলেই। ডক্টর আঙ্কেলের ফোনে নেটওয়ার্ক ছিলনা তাই সরাসরি হাসপাতালে ট্রাই করেছে। বাকি যোগাযোগ কপালগুণে খাপে খাপে মিলে গেছে – ড্যাডির আয়ু ছিল বলেই না।

কিন্তু ঘটনার ধাক্কায় বাড়ির মানুষগুল ওকে মানুষের মত সম্মান দিচ্ছে দেখে ভালোলাগায় মন ভরে যাচ্ছে টিকলির। রনি বাবা মায়ের সাথে একদম স্বাভাবিক। টিকলির সাথেও সবার সামনে স্বাভাবিক দেখানোর সফল চেষ্টা চলে, কিন্তু আড়ালে হিমশীতল।

দুমাস হয়ে গেল – এবার ওঁরা ফিরে যাবেন। রনি আর টিকলি এবার মুখোমুখি হবে। আর মানুষের আড়ালে ওদের থাকা হবেনা।

ওঁরা চলে গেলেন এক রবিবার। দুজন মিলে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এল।

পরদিন অফিস থেকে ফিরে স্নান সেরে সোফায় মোবাইল হাতে বসল টিকলি। কিছু পরে কালো কফি নিয়ে রনি উলটো দিকের সোফায় না বসে, গিয়ে বসল স্টাডিতে।

টিকলি উঠে গেল। আজ কথা বলতেই হবে, জানতে হবে কি হয়েছে রনির।

– কথা বলতে চাই।

– বল।

– তুমি বল।

– আমার তো বলার নেই।

– কেন বলার নেই সেটাই জানতে চাই ?

– তার মানে ?

– তার মানেটা তুমি বলবে। কি হয়েছে যে তুমি আমার সাথে কোল্ড বিহেভ করছ ?

– কেন তোমায় কি মাথায় তুলে নাচতে হবে ?

– রনি! হোয়াট ইস ইওর প্রব্লেম? ইউ নো আই ডোন্ট লাইক আরগুইং।

– দেন প্লীজ স্টপ, আই হাভ টু ফিনিশ মাই ওয়ার্ক।

– না আগে বল কি হয়েছে। কি করেছি আমি – কোথায় তোমার প্রব্লেম?

– ইউ শুড বি হ্যাপি। মম ড্যাড তোমায় – আই মীন রাতারাতি ইউ হ্যাভ বিকাম আ হিরো।

– সিরিয়াসলি রনি? আর ইউ জেলাস অব মি ?

– হাহাহা ইউ আর ক্রের্জি।

– নো আই এম নট। টেল মি ক্লিয়ারলি – একজ্যাক্টলি কি চলছে তোমার মনে ?

– নাথিং। ইউ আর ক্রিয়েটিং থিংর্স।

– রনি, ইউ নো হোয়াট, ইউ হ্যাভ এন ইনফ্লেটেড ইগো। শভিনিজম, মেল ইগো। এই ঘরে তুমি আমায় তোমার আন্ডারে রাখতে চেয়েছো। তোমার মা আমাকে ভুল বুঝলে আমাকে একটা বারও জিজ্ঞেস না করে, আমাকে অপমান করেছ, করেই গেছ। তোমার প্রপারটি মনে করে এসেছ আমাকে। এতে তোমার রিগ্রেট হয়নি – বরং স্যাটিসফেকশন হয়েছে। আমি তোমার বউ। আমাকে আঘাত দেওয়া তোমার স্বামী হিসেবে অধিকার। তুমি ভাব ম্যারেজ তোমাকে সেই অধিকার দিয়েছে।

– ড্যাডি যেদিন অসুস্থ হলেন, আমি ডাক্তার আঙ্কল কে ট্রাই করে না পেয়ে গুগলে হাসপাতালের নাম্বার খুঁজছি। কাঁপছি আমিও। অথচ তুমি মনে করেছিলে আমি ফোন নিয়ে খেলছি। এটুকু চেনোনা তুমি আমাকে রনি, যে আমি একটা অমানুষ নই? আমি কোনোদিন জ্ঞানত তোমার বাড়ির লোককে অবহেলা করিনি। কেন করব ? – মানছি সবাইকে খুশি করার জন্যে অতিরিক্ত কিছুই করিনি – কারণ বাড়ির বউ হিসেবে নাম কেনার শখ আমার

নেই। কাজের লোক আছে, তোমার মা সুস্থ মানুষ, খামোখা কাজ করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে ইস্প্রেস করতে বসব – সেসব ইচ্ছে হয়নি। বাড়ির মেয়ের মত, বাড়ির একজন সদস্যর মতন থাকব। একজন মানুষ হিসেবে মানুষের মত কাজ করব আবার সাধারণ মানুষের মতই অলস হতেও চাইব কখনও। পারফেক্ট হতে আমি চাইইনা। কিন্তু তোমাদের সবার পারফেক্ট বউ চাই। নাই বা হোক পারফেক্ট স্বামী বা শাশুড়ি।

পারফেক্ট না হবার অপরাধে তুমি ন্যুনতম মানুষের সম্মানও পাবেনা। কেন ? কেন প্রতি পদে অসম্মান করতে হবে ? কোন অধিকারে ? বিয়ে করে এসেছি বলেই ? দয়া করেছ তুমি আমায় রনি ? বিয়ে করে দয়া করেছ ?

রনির মাথা নিচু হয়ে চিবুক বুকে ঠেকে। এই কথাগুলো শুনে রনির আমূল বদল ঘটে গেল এমন তো নয়। কিন্তু কথাগুলোর মধ্যে এমন কিছু ছিল যে সেমুহূর্তে ও উত্তর খুঁজে পেলনা। পুরুষতন্ত্র মজ্জায় মজ্জায় বসে আছে, অজান্তেই। সেখান থেকে নিজেকে মুক্ত করা এতই কি সহজ।

সম্পূর্ণ একা ময়দানে দাঁড়িয়ে এই লড়াইটা টিকলিদের লড়তে হবে। শাশুড়ি, শ্বশুর, স্বামী এমনকি নিজের মা, বাবা সবাই উলটো দিকে দাঁড়িয়ে। সবাই একটা সিস্টেমের আদলে তৈরি হওয়া মানুষ। কেউ খারাপ বা ভাল নয়। আজন্ম লালিত সংস্কার থেকে বলবে মেনে নাও। নারী নারীকে বলবে। পুরুষ নারীকে বলবে। নারী নিজেকে বলবে – মানিয়ে নাও।

টিকলিরা অনুভব করবে, ঘুরে দাঁড়াবে, তাকে লড়ে যেতে হবে প্রতিনিয়ত, একা। সম্মানের জন্য। সাম্যের জন্য। তাতেই আলো জ্বলবে পরিবারে পরিবারে। নারী পুরুষ সম্মিলিত ভাবে নারীকে মানুষ বলে সম্মান করবে।

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য

পাঠকের কলম থেকে:-

গলার কাছটা জল পড়তেই জ্বালা করে উঠলো। শাওয়ার থেকে জলের ধারাগুলো ঘাড়ে পিঠে যেখানেই পড়ছে জ্বালা করে উঠছে পশমের। তবু সারা শরীর ভিজিয়ে নিচ্ছে ও। প্রায় প্রতি রাতের এই জ্বালা ওর শরীরে যত কষ্ট দেয় তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষত তৈরী হতে থাকে মনে। পুরো স্নান সেরে বেরিয়ে এসে নিজের নিরাভরণ শরীরকে খুব মন দিয়ে দেখতে লাগলো।

বেলের আওয়াজে ধড়মড় করে উঠে বসলো পশম। ঋষভ বেঁকে চুড়ে শুয়ে তখনো। পশম বুঝলো দেরী হয়ে গেছে, মালতী এসে গেছে। ঋষভকে তাড়াতাড়ি তুলে দিলো ও। ঋষভ কোনমতে টাওয়েল জড়িয়ে ওয়াশরুমে দৌড়োলো। রান্নাঘরে মালতী আর পশম দুজনে ব্রেকফাস্ট বানাতে ব্যস্ত। মালতী পশমের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো আজ দিদির কেন উঠতে দেরী হলো সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে।

মালতী ওদের ফ্ল্যাটে শুরু থেকেই কাজে আসছে। রোজ ক্যানিং থেকে আসে সেই ভোরের ট্রেন ধরে। তিন বাড়ির কাজ। পশমের চেয়ে সামান্য ছোটই হবে বয়সে। আর পাঁচটা কাজের লোকের মতোই, বর রোজগারের বেশিটাই মদ আর জুয়ায় উড়িয়ে দেয়। দুই মেয়ে, দায় দায়িত্ব সব মালতীর। পশম ওকে ঠিক কাজের লোকের মত করে ভাবে না। মেয়েটার চোখে একটা মায়া আছে। এত খাটা খাটনিতেও শরীর অটুট। শাড়ির আঁচল আলতো সরে গেছে, পশম ওর কথা শুনে ওর দিকে তাকাতেই চোখ পড়ে ওর বুকের বিভাজিকায়, কিরকম শিরশির করে ওঠে ওর শরীর। তোমার গলার দাগ দেখেই ধরেছি সব। দাদাবাবু কি একটু ... কথা শেষ করার আগেই পশম বলে ওঠে

– মালতী আবার শুরু করলি।

– মালতী একটু গলা নামিয়ে বলে আমার মিংসে তো এখনো ছেলে ছেলে করে লাফায়। রোজ রাতে তার চাই। জানেও না আমি সব বাদ দিয়ে দিয়েছি।

– কি বাদ দিলি রে ?

– ওই যে গো দিদি আর যাতে বাচ্চা না হয় সেই কেটে এসেছি। মিংসের আদরের ছিরি দেখবে ? শাড়ির আঁচল আরো সরিয়ে বুকের কাছে লাল কাটা দাগ দেখায়। পশম কেমন ঝিমঝিম করে ওঠে। মালতী বলে চলে ফালা ফালা করে দেয় গো আমায়।

– আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি করো। ঋষভ তাড়া দেয়। ওর ব্রেকফাস্ট টেবিলে দিয়ে লাঞ্চ রেডি করতে থাকে পশম।

– কি মালতী কি খবর ? তোর মেয়েদুটোর জন্য বই আর খাতা এনে রেখেছি। স্কুলটা ছাড়াস না কিন্তু।

– আজ্ঞে দাদাবাবু আপনি ভগবান মানুষ। আপনার জন্যই ...

– থামবি তুই, নিয়ে যাস মনে করে, তোর বরের ওষুধ ও আছে। মালতী পশমের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, এমন মানুষ ভাগ্য করলে পাওয়া যায় দিদি। পশম কিছু বলে না, ওর হাতটা নিজের গলার কাটা দাগটায় আনমনে হাত বুলিয়ে চলে।

ঋষভের আজ কি সব মিটিং আছে, ওর দেরী হবে আসতে। পশম ওর শান্তিনিকেতন থেকে আনা খাতাটা খুলে বসে। লেখালেখি করা ওর স্বভাব। তিন বছর হলো বিয়ে হয়েছে। ভবানীপুরের শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে রাজারহাটের এই ফ্ল্যাটটায় একবছর হলো এসেছে। ছিমছাম দু কামরার ফ্ল্যাট। ও যত্ন করে সাজিয়েছে। শ্বাশুড়ী মা গত হয়েছেন ওর বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই। শ্বশুর-মশাই আগেই গত হয়েছিলেন। পশমের বাপের বাড়ি বালিগঞ্জ। মা বাবা আরো একটু ভাল বিয়ে মানে, আরো বিত্তবান ছেলের কথা ভাবলেও ভালবাসা বাধা মানে নি। প্রায় আট বছরের সম্পর্ক ওদের। পশমের মা বাবা খুব একটা আসেন না, টেলিফোনেই যোগাযোগ। ওদের এই বিল্ডিংয়ে এখনো সবাই এসে পৌঁছয় নি। ওদের নিয়ে আরো চার ঘর মোট। সদা ব্যস্ত মোড়কে এখনো প্রায় সবাই অপরিচিত। পশমের ব্যালকনিতে নানান গাছ। মালতী কাজ সেরে চলে গেছে। ওর স্নান খাওয়া শেষ। খাতার পুরোনো লেখাগুলো পড়ছিল। বিকেল নেমে আসছে, একটা মরা আলো আকাশে লেগে, ও ব্যালকনিতে এসে দাড়ালো। উঁচু উঁচু বিল্ডিংগুলো ছাড়িয়ে আকাশের ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া দেখছিল ও। সন্ধ্যাটা ঝুপ করে নেমে এলো।

সব সেরে বেরোতে বেরোতে ন'টা বাজলো ঋষভের। ওর গাড়ী আজ গ্যারেজে। একটা উবার ডাকলো। আসতে আসতে আরো সাত মিনিট। একটা সিগারেট ধরাল। আজ খুব ঝাড় খেয়েছে। মেজাজ খারাপ। বাড়ি ফিরেই সোজা স্নানে ঢুকলো।

– আজ খাবো না, ক্ষিদে নেই। মিটিংয়ে প্রচুর খাওয়া ছিল। পশম কিছু না বলে খেয়ে সব কাজ সেরে বিছানায় এলো। বিরক্ত ঋষভ সব বিরক্তি ওর শরীরময় মাখিয়ে দিতে থাকলো। পশম গঙ্গার ধারে বসা ওর বিট্টুকে খুঁজতে থাকে।

ঋষভ বেরিয়ে গেছে। পশম আর মালতী গল্প করছিল। গল্প মানে মালতীর গ্রামের গল্প। ওর বরের গল্প। ওর দুই মেয়ের কথা। পশম মূলত শ্রোতা।

– ও দিদি তোমার কি মন ভাল নেই।

– পশম বলে হুঁ আছে তো।

– না তোমায় কেমন উদাস দেখায়।

পশম হেসে ওঠে। মালতী বলে আজ তোমার চুলে তেল লাগিয়ে দি চলো। পশম তেল দেয় না বড় একটা। আজ না বললো না। চুপ করে মাথা হেলিয়ে বসে রইলো। মালতী অনেকটা নারকেল তেল এনে ওর মাথায় মালিশ করতে লাগলো। ওর শরীর থেকে একটা হলুদ মাখা রসুন পিঁয়াজের গন্ধ আসছিল। ভাল লাগছিল পশমের। চোখ বুজে এসেছিল। বেল বাজলো।

পশমের মা। মালতীর দিকে একবার তাকিয়ে হাতের ফুল আর টুকিটাকি কিছু জিনিস নামিয়ে বসে মালতীর দিকে তাকিয়ে বললো

– এই যে আমাকে একটু জল খাওয়াবে? মালতী এক ছুটে জল এনে দিল।

– কি খবর তোর?

– ভাল আছি গো। বাবা?

– তোর বাবা তো নিজেকে নিয়েই মত্ত। আজ ক্লাব তো কাল পার্টি। পশম হেসে ফেলে।

– তুই তেল মাখছিস?

– হুঁ, ও বড় ভাল মালিশ করে। ওদের কথার মাঝে মালতী ফ্রিজে রাখা ভেটকির ফিলে বের করে ফ্রাই করে ফেলেছে। আবার অন্য দিকে চিনি ছাড়া ব্ল্যাক কফি। পেখম মল্লিক, পশমের মা, অবাক চোখে মালতীর দিকে তাকাতেই মালতী বলে উঠলো দিদি সব গল্প করেছে আমায়। পশম দুষ্টু চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে ওর মা'র দিকে।

– চলো মা ঘরে যাই।

– নাঃ চল তোর ব্যালকনি তে যাই। ওরা দুজন ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায়।

– মালতী এদিকে আয়।

রোদ্দুরটা একটু তেরচা হয়ে পড়ছে। শীত এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে সময়টায় এই রোদ্দুরটা মিঠে লাগে। ওদের চেয়ারের নীচে একটু দূরে বসে মালতী।

– পশম বলে তুই তেল'টা লাগাতে থাক। পেখম কফিতে চুমুক দেয়, ফ্রাই তে কামড় বসায়। মালতীর উৎসুক চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে ভাল হয়েছে।

– মালতী বলে ওঠে সব দিদি শিখিয়েছে।

– মা আজ কিন্তু না খেয়ে যেও না।

– আজ ভাবছি থেকে যাবো। উঠে বসে পশম। মার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বলে সত্যি!! মালতীও কিরকম যেন খুশী হয়ে যায়।

– বলে কি রান্না করবো গো দিদি। দুপুরে খেতে বসার পরে পেখম ওর ব্যাগের ভিতর থেকে বের করে আনে তেঁতুলের আচার।

– মা ... কত দিন পরে ... তুমি আবার ঝগড়া করেছ বাবার সাথে। পেখম হেসে ফেলে। তুমি রেগে গেলে আচার বানাতে। পেখমের ফোনটা বেজে ওঠে ...

– মা বাবার ফোন।

– ধরে নে তুই। হ্যালো ... ও যা ভেবেছি তাই।

– কেমন আছিস ?

– ভাল বাবা।

– তোর মা কি আজ ...

– হ্যাঁ গো তাই তো বললো।

– বেশ, তবে যখন যা করবে একটা খবর যেন দেয়।

– বাবা চিন্তা করো না।

পশম ফোন করে ঋষভকে, জানায় মার আসার খবর। একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে ঋষভ। রাতের খাবার সাথেই নিয়ে আসে। পেখমও আজ মেয়ে জামাইয়ের সাথে গল্পে মশগুল। আজ রাতে একঘরে এক বিছানায় পশম আর পেখম। বহুদিন পরে মায়ের কোল ঘেঁষে শুয়ে পশম। বাবার সাথে ফোনে কথা বলছিল মা।

– কি গো মানভঞ্জন হলো ?

– তোর বাবা কি কোনদিন আমার কথা বুঝেছে। একটু চুপ করে যায় বাপ নেওটা পশম। আজ যেন অনেক কিছু ভাবনা বদলে গেছে।

এই ঘরেও একটা ছোট ব্যালকনি আছে।

– চল একটু বাইরেটায় দাঁড়াই। পেখম বলে ওঠে। ওরা ব্যালকনিতে। গায়ে চাদর জড়িয়ে রাতের আকাশের মিটিমিটি তারাগুলোর সাথে অতীত রোমন্থনে ব্যস্ত। নিয়নের আলোয় রাত ধুয়ে যাচ্ছে। ঠান্ডার পরশ মেখে মা মেয়ে আজ মখমলি।

রাত ভোর হলে মালতীর প্রবেশ, ঋষভের অফিস বেরোনো। মা'ও ফিরবে। মালতী নিচু হয়ে ঘর মুছছে। পশমের চোখ আটকে গেল ওর শরীরে। ওর নিতম্বের দোলায় কেমন কেঁপে উঠলো। পেখম মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু এঁকে দিল।

– মালতী বললো আবার এসো না একদিন, পিৎজা বানাবো।

– পেখম বললো আসবো। মালতীর মুখে গলায় শীত কালেও অল্প ঘাম। কাল ঋষভ পশমের শরীরে কোন আঁচড় কাটতে পারে নি। আনমনে সব্জি কাটতে গিয়ে বুড়ো আঙুলে ছুরিটা বসে গেল। মালতী দৌড়ে এসে কেটে যাওয়া আঙ্গুলটা মুখে পুড়ে দেয়। ওর বুকের ওঠানামা পশমকে চঞ্চল করে তোলে। মালতী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি বুঝলো কে জানে আরো কাছে ঘেঁষে এলো।

শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে নিরাভরণ পশম। ওরা স্নান করছে। ও আর মালতী। দুজনের ভেজা শরীর আবেগ আর উন্মাদনা মেখে ভিজে চলেছে। নিজেদের শুকনো করে বসতেই টুং করে মেলটা এলো। আগেই বুঝতে পেরেছিল ও, তবু ল্যাবে পাঠিয়েছিল টেস্টের জন্য। রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। মোবাইলটা নিয়ে ঋষভের নাম্বার ডায়াল করলো পশম। ঋষভ বাড়ি ফিরল একটু তাড়াতাড়িই। চোখে মুখে খুশী আঁকা। ঘরে ঢুকেই ওর কপালে আর চোখে আলতো করে চুমু খেলো। মালতীও খুশী ছিল খুব, জানতেই খুশিতে লাফাতে বলেছিল তোমাদের ছেলে হবেই। ঋষভ বললো ছেলে হলে নাম রাখবো মিছিল। পশম কিছু বললো না, আয়নার সামনে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নাম ঠিক করে ফেললো ওর মেয়ের রেশম।

Ananda Sen — Ananda is a Professor of Biostatistics at University of Michigan. Ananda also passionately pursues the hobby of acting whenever he can. When feeling stressed, he takes recourse to the Abhro keyboard on his desktop and types up Bengali poems. He is a regular contributor to Batayan. Ananda lives in Ann Arbor, Michigan with his wife and two kids.

দেবীপ্রিয়া রায় – লিখছেন স্কুল ও কলেজের দিন থেকে । পেশায় দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপিকা ও গৃহিণী । কাশীর প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মেয়ে দেবীপ্রিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে ডক্টরেট করে বিবাহসূত্রে সেই বছরেই আমেরিকা এসে শিকাগো শহরে বাসা বাঁধেন । গত ৪০ বছর শিকাগোর বাঙালী ও অবাঙালী সমাজের সাথে নানা ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন । সাহিত্য চর্চা দেবীপ্রিয়ার নেশা । শিকাগোর উন্মেষ সাহিত্য গোষ্ঠীর তিনি অন্যতম সদস্য ।

মৌসুমী রায় – সেবায় ও পালনে, শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় ব্যস্ত গৃহবধূ । যৎসামান্য অবকাশের আকাশে রামধনুর খোঁজ, কবিতা লেখায়, সাহিত্য পাঠে । পাঠকের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা । উপরি পাওনা প্রাঞ্জল গদ্য আর কিছু নয়নাভিরাম ছবি ।

Pritha Banerjee — is a dancer, poet and writer. She lives in Sydney, Australia.

Priya Chakraborty – "Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead." – An ardent Bukowski fan and a self claimed "bheto-bangali", Chakraborty was born and brought up in Chandannagar, and had always been a art enthusiast, taking up a specific interest in painting and writing. Also, a trained classical dancer, she continues to restore the Bengali in her in bits and pieces, through all things creative and Bengali.

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় – শিকাগোর বাসিন্দা । পেশায় শিক্ষিকা । আর নেশায় পড়ুয়া । বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই লেখাপড়া করার অভ্যাস আপাতত । রঞ্জিতার প্রেম হল বাংলা ভাষা, সাহিত্য আর মাঝে মাঝে কিছু লেখালিখি । রঞ্জিতা 'বাতায়ন' পত্রিকার গোষ্ঠী সম্পাদিকা । শিকাগোর স্থানীয় সাহিত্যগোষ্ঠী উন্মেষের সঙ্গে উনি প্রায় এক দশক ধরে যুক্ত । সহলেখিকা হিসেবে রঞ্জিতার দুটি বই এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে – ''Bugging Cancer'' আর ''Three Daughters Three Journeys'' । সাহিত্যের হাত ধরে ভৌগোলিক সীমানার বেড়া ভাঙায় বিশেষ আস্থা রঞ্জিতার ।

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় – ঐতিহ্যময় শহর চন্দননগরের স্থায়ী বাসিন্দা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির স্নাতক । ১৯৯৬ সালে প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'দিবারাত্রির কাব্য' পত্রিকায় । ২০০১ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় । 'আনন্দবাজার', 'বর্তমান', 'আজকাল', 'প্রতিদিন', 'তথ্যকেন্দ্র', 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' ছাড়াও, 'অনুষ্টুপ', 'কুঠার', এবং 'মুশায়ারা'-র মতো বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনেও তার কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রকাশের ধারা অব্যাহত । প্রকাশিত উপন্যাস পাঁচটি, গল্পগ্রন্থ তিনটি, এবং কবিতার বই একটি ।

Saswati Basu — Profession: University Teacher in Economics, lives in Sydney. I enjoy this beautiful life thoroughly. Particularly I enjoy listening to songs, reading books on sociology, short stories, and travelling around. I love watching drama, good cinema and tennis. I also love to experiment with new cooking recipes and share them with our friends. Believe in donating money to voluntary organisations for the people in need.

সোমা ঘোষ (চক্রবর্তী) – চলতি হাওয়া ও পূর্বপশ্চিম এই দুই পত্রিকার সম্পাদক । UKBC -র একজন ট্রাস্টী । সৃষ্টিসুখ প্রকাশনা থেকে গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে । বাচিক শিল্পী হিসেবে কাজ করি । যুক্তরাজ্যে Indian Arts Association নামে একটি কালচারাল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করি । কিঞ্চিৎ লেখালিখি করি আর প্রাণভরে আকাশ দেখি ।

শকুন্তলা চৌধুরীর – জন্ম কলকাতায়, বড় হয়েছেন বি.ই. কলেজ ক্যাম্পাসের প্রফেসরস কোয়ার্টারে । পড়াশোনা কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে । বিয়ে এবং তথ্যবিজ্ঞানে পি.এইচ.ডি করার সূত্রে বিদেশগমন । কর্মসূত্রে বর্তমানে মিশিগানের বাসিন্দা । স্কুলজীবন থেকেই নিয়মিত লেখেন । সানন্দা, বাতায়ন, পরবাস, সাহিত্যকাফে, ঋতবাক এবং আরো বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে শকুন্তলার কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস । শকুন্তলার লেখা গান ভিডিওতে পরিবেশন করেছেন রূপঙ্কর বাগচী, নচিকেতা চক্রবর্তী, কায়া ব্যাণ্ড । প্রকাশিত গ্রন্থ পৃথা (ঋতবাক প্রকাশনী) ।

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য – কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য সম্প্রচার দপ্তরের কর্মী । বর্তমানে কলকাতা দূরদর্শন ভবনে কর্মরত । বহুদিন থেকেই চলে আসছে সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠ এবং নিভৃত চর্চা । পেশাগত ও পারিবারিক ব্যস্ততায় যখন হারিয়ে যেতে বসেছিল তাঁর এই সৃষ্টিশীলতার ধারা, সে সময় এক বুধ সকালে আকাশবাণী মৈত্রীতে তাঁর নিজের লেখা পড়তে শোনা (এবং তারপর থেকে প্রায় নিয়মিত সেরার বাছাই এর তালিকায়), তাঁর সাহিত্যচর্চায় নতুন উৎসাহের সঞ্চার করে । সেই থেকেই চলে আসছে জীবনের জলরঙে স্বপ্ন বোনার কাজ, কখনো ছন্দে, কখনো বা গদ্যে . . .

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে। এবারেই প্রথম কলম ধরেছেন বাতায়নের পাঠকদের জন্য।

Sudipta Bhowmik — He lives in USA. He is an engineer by profession but his passion is drama. His plays have been staged in different cities of US and India. His plays have been translated in Hindi, Marathi and English. He is a member of Dramatist Guild of America and founder of his own theater group in New Jersey called ECTA (Ethnomedia Center Of Theater Arts).

সুজয় দত্ত – ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন। Batayan Incorporated থেকে সদ্য প্রকাশিত ''এক বাস্ক চকলেট'' গল্পের বইটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে।

Shuvra Das is a Professor of Mechanical Engineering and lives in the greater Detroit area. He graduated from IIT Kharagpur in India and finished his PhD from Iowa State University. Photography, painting, writing, theater, and travel are some of his passions. Lately, he has been spending a lot of time in political activism.

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। বিভিন্ন প্রকাশিত গল্প কবিতা 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি', 'অমৃতের সন্তানসন্ততি', 'ঈশ্বরকে স্পর্শ', 'মায়াবী পৃথিবীর কবিতা', 'সুধাসাগর তীরে', 'সে মহাপৃথিবী', 'আকাশকুসুমের পৃথিবী'। কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্পও করতে ভালবাসেন।

এম ডি এন্ডারসন ক্যান্সার সেন্টার-এ গবেষণায় রত **উদ্দালক** অবসরে কবিতা পড়া, লেখা এবং অনুবাদ নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। উদ্দালকের কবিতা এবং অনুবাদ, কলকাতা এবং আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকা যেমন প্রবাসবন্ধু, দুকূল, বাতায়ন, সংবাদ-বিচিত্রা, স্বজন, প্রথম আলো, ভাষাবন্ধন, অর্কিড, ম্যাজিক-ল্যাম্প, স্বপ্নরাগ ইত্যাদিতে ছাপা হয়েছে। বঙ্গীয় মৈত্রী সমিতি দ্বারা প্রকাশিত বাংলার বাইরে বসবাসকারী লেখকদের কবিতা সংগ্রহ "কবিতা পরবাসে" এবং আন্তর্জাতিক বিজয়ওয়াড়া সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং অমরাবতী দ্বারা প্রকাশিত আন্তর্জাতিক, বহুভাষী কবিতাসংগ্রহ, Poetic Prism-এও স্থান পেয়েছে উদ্দালকের কবিতা। কবিতার বিষয় মূলত প্রেম হলেও, জীবনের আরও নানান উপলব্ধির প্রতিক্রিয়ায়ও উদ্দালক প্রকাশ করে রাখেন তার অনুভব। কখনো তা কবিতা হয়, কখনো শুধুই স্বগতোক্তি। সম্প্রতি নিউ জার্সির আনন্দ মন্দির প্রদত্ত গায়ত্রী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষতার জন্যে। স্ত্রী নীতি ও পুত্র সায়ন-কে নিয়ে উদ্দালক টেক্সাসের হিউস্টন শহরে থাকেন।

Urmi Chakraborty presently lives in Sydney. She has a great passion for travelling and love to explore new places, avid reader of english novels. She wrote numerous hindi poems and english articles in facebook and different blogs. She is extremely happy to share her creation with Batayan's readers.

আজ সকালে সন্ন্যাস রঙ পরেছিল নবীন আকাশটা। কোথা থেকে পাতাঝরা রুখু ডাল,
ওর বুকে চুপি চুপি এলোমেলো আঁক কষতেই – গেরুয়া খুলে ও আজ ঠিক নীল পরবে।

ISBN 978-0-6487688-8-3
9 780648 768883 >

বাতায়ন

ISSUE | MARCH 2022